প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে চল্লিশ আসর

[বাংলা]

আদেল বিন আলী আশ-শিদ্দী

অনুবাদ: সানাউল্লাহ নজির আহমদ/ কামাল উদ্দিন মোল্লা
সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

1431 – 2010

islamhouse.com

أربعون مجلساً في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم

[اللغة البنغالية]

عادل بن علي الشدي

ترجمة : ثناؤ الله نذير أحمد/ كمال الدين ملا

مراجعة : إقبال حسين معصوم

1431 – 2010

islamhouse.com

প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে চল্লিশ আসর

বইটিতে যা যা পাবেন :

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿১৬৪﴾

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর ইহসান করেছেন তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করে, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনায়, তাদেরকে বিশুদ্ধচিত্ত করে, এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইত:পূর্বে সুস্পষ্ট বিপথে ছিল।

দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি সৃষ্টির সেরা ও সর্বোত্তম, বিশ্ববাসীর আদর্শ, আল্লাহ ভীরুদের ইমাম, নবী-রাসূলদের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী ও বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ এবং যাকে আল্লাহ তাআলা মনোনীত করেছেন। কুরআনে এসেছে :

আর তোমার প্রভুর যা ইচ্ছা ও পছন্দ তা তিনি সৃষ্টি করেন। এবং আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের যাকে ইচ্ছা রাসূল হিসেবে নির্বাচন করেন ও মানুষদের থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে রাসূল হিসেবে নির্বাচন করেন।

তিনি তাঁকে সাক্ষ্য দাতা, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এবং আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে পাঠিয়েছেন।

সুতরাং যে তার পথে চলবে তার জন্য তিনি সম্মান, সৌভাগ্য ও গৌরব নির্ধারণ করেছেন। আর যে তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার জন্য তিনি অপমান, দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনা নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর ততবার বর্ষিত হোক যতবার আল্লাহ ওয়ালারা পাঠ করে ও যতবার রাত্র দিনের আনা গোনা হয়।

আমারা সকলেই জানি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস অপেক্ষা উত্তম আর কোন মজলিস হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীতে তাঁর সাথে ওঠা-বসা, তার কাছ থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ ইত্যাদির সংলগ্নতায় আসতে পেরেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের কাছে পাওয়ার সুবাদে। আমাদের ক্ষেত্রেও তাঁর সীরাত অধ্যয়ন করা, তাঁর সুন্নতের পাঠোদ্ধার, তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের চিহ্নগুলো নির্ণয় করা -যা পূর্ণাঙ্গ করুণা, উদারতা, ভদ্রতা, সম্মান ও সদাচারে ভরা- আল্লাহর রহমত ও করুণায় সহজসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অনেক দিন থেকেই সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য কিছু অধ্যায় রচনার চিন্তা আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও তাঁর জীবনের অনুসরণীয় দিকগুলো একজন মুসলমানের সামনে উন্মোক্ত করবে। এবং নিম্নোক্ত আয়াতের দাবি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। ইরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿২১﴾

.

নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক স্মরণ করে।

আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে আসেন তা আঁকড়ে ধর। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।

আমি এই অধ্যায়গুলোকে টীকা-টিপ্পনি দিয়ে জটিল ও ভারি করতে চাইনি। কেননা এ অবস্থায় পাঠকবৃন্দের মনোযোগ মূল বিষয় থেকে সরে যেতে পারে। বরং আমি চেয়েছি বড় বড় অক্ষরে মূল আরবী কিতাবটি ছাপা আকারে দেখতে, যাতে শিক্ষাদানে আগ্রহী মসজিদের ইমাম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের পক্ষে নিজ নিজ মুসল্লিবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দান সহজতর হয়।

যারা চিন্তা, গবেষণা ও শ্রম দিয়ে বইটি বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়েছেন, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। বিশেষ করে উল্লেখ করছি আমার ভাই খালিদ আবু সালেহকে যিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংযোজন করে বইটি সমৃদ্ধ করতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এবং উস্তাদ মুহাম্মদ তায়ে'কে সম্পাদনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের জন্য। আরো ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখেন ফুসতাত প্রকাশনীর মালিক উস্তাদ ইমাম আরফাহ। ঝকঝকে ছাপায় বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যার অবদান অতুলনীয়। তাছাড়া তিনি বইয়ের মূল্য নির্ধারণ করেছেন যথেষ্ট কমিয়ে এতে করে বিনামূল্যে বিতরণে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ বইটি সহজে ক্রয় করতে পারবেন।

রচিত অধ্যায়গুলো যারা পড়বেন তাদের কাছে আমি আশা করতেই পারি দোয়ার মাঝে আমাকে ভুলে যাবেন না। যে কোন মন্তব্য অথবা পর্যালোচনার জন্য আমার ই-মেইল সব সময় উন্মোক্ত।

ই-মেইল এড্রেস :

adelalshaddy@hotmail.com

হে আল্লাহ, আমাদেরকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করার তাওফিক দান কর। তাঁর সুন্নাত ও সুমহান আদর্শের খাদেম বানিয়ে দাও। তাঁর অনুসরণের মধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও। হে আল্লাহ, জান্নাতে আমাদের সকলকে তোমার হাবিবের সান্নিধ্য দান কর। আমাদের যাবতীয় আমল একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদনের তাওফিক দান কর।

و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ড. আদেল বিন আলী আশশিদ্দী
কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক, উলূমুল কুরআন ও তাফসির বিভাগ
খতীব: জামে মসজিদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবাসিক এলাকা।

প্রথম আসর:

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অধিকার-১

সন্দেহ নেই, মহান আল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণ করে আমাদেরকে করেছেন সম্মানিত এবং তাঁর রিসালাতের সূর্য উদিত করে আমাদের প্রতি করেছেন সীমাহীন ইহসান ।

ইরশাদ হচ্ছে,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি ইহসান করেছেন। কারণ, তিনি তাদের মাঝে তাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনায়। তাদের আত্মসংশোধন করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।

আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক অধিকার রয়েছে, যা আদায় ও সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরি। বিনষ্ট ও অবহেলা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক।

সেসব অধিকারের কিছু নিম্নে বর্ণিত হল,

এক: তাঁর প্রতি ঈমান আনা

রাসূলুল্লাহর অধিকারসমূহের মধ্যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম অধিকার হল তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসাবে মানবে না, সে সত্যচ্ছুত-কাফির। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান এ ক্ষেত্রে তার কোনো কল্যাণে আসবে না।

পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াত আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয় এবং তার রিসালাতে সন্দেহ-সংশয় পোষণ হতে বারণ করে।

ইরশাদ হয়েছে -

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا (سورة التغابن: ٨)

সুতরাং তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে নূর আমি অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আনয়ন কর। {তাগাবুন:৮}

আরও ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (سورة الحجرات:

মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস-ায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ। {সূরা হুজুরাত:**১৫**}

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করা ধ্বংস ও কঠিন শাস্তির কারণ এ বিষয়টি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইরশাদ হয়েছে -

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

এটি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। {সূরা আনফাল:১৩}
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ, ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ" [رَوَاهُ مُسْلِمُ]

যার হাতে মুহাম্মদের আত্মা তার শপথ, এ জাতির যে-ই আমার নাম শুনেছে, হোক সে খ্রিস্টান কিংবা ইহুদি, অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করেছে, আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই। তা হলে সে জাহান্নামবাসী হবে।

দুই: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করা

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্যই তার প্রতি ঈমানের প্রকৃত প্রমাণ। যে ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনার দাবি করে অথচ তার আদেশ পালন করে না এবং তিনি যেসব বিষয় থেকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে না, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করে না। সে তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। আর ঈমান তো মনোজগতে আন্দোলিত একটি বিষয়, ব্যক্তির কর্ম ও আমল যাকে সত্যায়ন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাঁর দয়া ও করুণা একমাত্র আনুগত্যশীল ও আত্মসমর্পণকারীরাই পেয়ে থাকে।

তিনি বলেন:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ.

আমার রহমত সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। আমি তা লিখে দেব তাদের যারা আল্লাহকে ভয় করে, যাকাত দেয় ও যারা আমার আয়াত সমূহে বিশ্বাস করে।

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন ওইসব লোকদেরকে যারা আল্লাহর রাসূলের আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে।

ইরশাদ হয়েছে: -

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورة النور(٦٣)

অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে। (সূরা নূর:৬৩)

আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের আদেশে আত্মসমর্পণ ও তার হুকুমে আত্ম প্রশান্তি রাখতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورة النساء :٦٥)

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। {সূরা নিসা:৬৫}

তিন : মহানবীর প্রতি ভালোবাসা

উম্মতের কাছে মহানবীর প্রাপ্য অধিকারের মধ্যে একটি হল তাকে ভালোবাসা, সাধারণ অর্থে নয় বরং তা হতে হবে পূর্ণাঙ্গ, সর্ব-ব্যাপ্ত, ও অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ و وَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" [متفق عليه

তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা ও সমগ্র মানুষ হতে প্রিয়তম হব।

যে ব্যক্তির হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভালোবাসা নেই সে মুমিন হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। মুসলিম নাম ধারণ ও মুসলমানদের মাঝে বসবাস এ ক্ষেত্রে তাকে মুমিনদের দলভুক্ত করতে অপারগ বলে প্রমাণিত হবে।

সর্বোচ্চ ভালোবাসা হল মুমিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসবে নিজ থেকেও অধিক। ওমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একদা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বাদ দিয়ে সকল বিষয় থেকে আপনি আমার কাছে অধিক প্রিয়। প্রত্যত্তুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন

لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ". فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنَّه الْآنَ – وَاللهِ – لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ" :الْآنَ يَا عُمَرُ" [رواه البخاري.

না, আমার আত্মা যার কবজায় তাঁর কসম, আমাকে তোমার নিজ সত্তা থেকেও অধিক ভালোবাসতে হবে। ওমর বললেন: আল্লাহর কসম নিশ্চয়ই আপনি এখন আমার কাছে আমার নিজ সত্তা থেকেও অধিক প্রিয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন হয়েছে হে ওমর।

চার: রাসূলের পক্ষাবলম্বন ও তাঁকে সাহায্য করা

জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এটি। তাঁর জীবদ্দশায় এ দায়িত্ব অনুপুঙ্খভাবে আদায় করেছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আর তাঁর ওয়াফাতের পর এ দায়িত্ব পালিত হবে তাঁর সুন্নত সংরক্ষণের মাধ্যমে, যদি তা কোন অপবাদের অথবা মূর্খদের বিকৃতির বা বাতিলপন্থীদের বানোয়াট রচনার শিকার হয়। ব্যক্তি রাসূলকে প্রতিরক্ষার মাধ্যমেও এ দায়িত্ব পালিত হবে, যদি তিনি আক্রান্ত হন কারও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের, অথবা যদি কেউ তাঁর সুউচ্চ অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করার স্পর্ধা দেখায়।

বর্তমানে মহানবীর ব্যক্তিত্ব আক্রমণের শিকার হচ্ছে অহর্নিশ। এমতাবস্থায় সমস্ত উম্মতের দায়িত্ব হবে,সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করা। তাদেরকে এ অন্যায় আচরণ হতে বিরত রাখতে যার-পর-নাই চেষ্টা করে যাওয়া। এবং এ ক্ষেত্রে সকল মাধ্যম ব্যবহার করে মহানবীর স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং মিথ্যাচারিতা ও অপবাদ থেকে বিরত হতে অন্যায়কারীদেরকে বাধ্য করা।

দ্বিতীয় আসর: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অধিকার-২

পাঁচ: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ওয়াফাদারীর একটি দাবি হচ্ছে, সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করা। রাসূল বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً আমার পক্ষ হয়ে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজন মাত্র ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন তা হবে তোমার জন্য লাল উট থেকেও উত্তম।

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ

আমি কিয়ামত দিবসে অন্যান্য উম্মতের ওপর তোমাদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব।

উম্মতে মুহাম্মাদীর আধিক্যের একটি মাধ্যম হল, ইসলাম প্রচার এবং অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর ইসলাম ধর্মে ব্যাপক প্রবেশ। আর আল্লাহ তাআলা স্পষ্টকরে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর প্রতি লোকদের দাওয়াত প্রদান সমস্ত নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের দায়িত্ব, পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে।

ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

বল! এটি আমার পথ। আল্লাহর প্রতি আহ্বান করি, যথার্থ জ্ঞান নিয়ে, আমি ও আমার অনুসারীবৃন্দ।

সুতরাং উম্মতের প্রতিটি সদস্যের উচিত, তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান হয়েছে, তা যথার্থভাবে পালন করা। যেমন, দাওয়াত ও সত্য পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজ। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ ইত্যাদি।

ইরশাদ হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

তোমরা উত্তম জাতি, তোমাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ হতে বারণ করবে, এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

ছয়: জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযথ সম্মান করা

এটিও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিকার যা অবহেলিত হচ্ছে উম্মতের অনেক সদস্যের দ্বারা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾.

নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর,তাঁকে সাহায্য কর ও সম্মান কর, আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

ইবনে সুদী বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সহযোগিতা ও সম্মানের অর্থ হলো, তাঁর তাজিম করা, তাঁকে বড় বলে জানা, তাঁর অধিকারসমূহ আদায় করা। কেননা তাঁর বিশাল দান ও অনুগ্রহ তোমাদের সবারই উপর রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাজিম-সম্মান-শ্রদ্ধায় সাহাবাগণ ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলতেন এতই শ্রদ্ধা ভরা নির্লিপ্ততায় তাঁরা তা শুনতেন, মনে হত যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে।

যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হল,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

হে মুমিনগণ, নবীর আওয়াজের ওপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না, এবং তোমাদের পরস্পরে কথা বলার সময় যেভাবে উচ্চ কণ্ঠ হও সেভাবে নবীর সামনে কথা বল না, এতে তোমাদের কর্মসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তোমরা তা টেরও পাবে না।

আবুবকর রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আল্লাহর কসম, এখন থেকে আমি আপনার সাথে নিতান্তই ক্ষীণ আওয়াজ ব্যতীত কথা বলব না।

ওফাতের পর রাসূলুল্লাহকে সম্মানের অর্থ তাঁর সুন্নতের অনুসরণ, তাঁর নির্দেশসমূহের তাজিম করা, তাঁর বিচার ফয়সালা মেনে নেয়া, তাঁর বাণীসমূহের বিষয়ে আদব অবলম্বন করা, কোন মাযহাব বা ব্যক্তির অভিমতকে কেন্দ্র করে তাঁর হাদীসের বিপক্ষে না যাওয়া। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, এ-ব্যাপারে মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন সুন্নত যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় তবে কোন ব্যক্তির অভিমতের ভিত্তিতে তা ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে না।

সাত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম যতবারই উল্লেখ হবে তাঁর প্রতি দরূদ পড়া

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাত পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন, হে মুমিনগণ তোমরাও রাসূলের প্রতি সালাত পাঠ করো এবং তাকে সালাম দাও উত্তম পন্থায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَال رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلّ عَلَيَّ" [رواه مسلم]

ঐ ব্যক্তি অপদস্থ হল, যার কাছে আমি আলোচিত হলাম অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।

তিনি আরো বলেছেন,

وَقَالَ: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً" [رواه الترمذي, وحسنه الألباني .

কিয়ামত দিবসে আমার অতি নিকটজন হবে ঐ ব্যক্তি যে আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করে।

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

وَقَالَ: "الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه وَلَمْ يُصَلّ عَلَيَّ" [رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني

প্রকৃত কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার কাছে আমি আলোচিত হলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উল্লেখ হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন মুসলমান তাঁর প্রতি সালাত পাঠ না করে তবে এটা হবে নিশ্চিত অন্যায়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام

গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাত পাঠের বহু উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। দরূদ ও সালাম বিষয়ে এ বইটি পাঠ করার জন্যে সকলকে পরামর্শ দেওয়া হল।

আট: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুদেরকে ঘৃণা করা

ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

তুমি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের ভালোবাসে। হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা,পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে এক রূহ দ্বারা। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। {সূরা মুজাদালাহ:২২}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মুওয়ালাত বা বন্ধুত্বের একটি দিক হল, তাঁর সাহাবাদেরকে ভালোবাসা ও তাদেরকে বন্ধু ভাবা। তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন থাকা। তাদের প্রশংসা করা। তাদের অনুসরণ করা ও তাদের জন্য ইস্তিগফার করা। সাহাবাদের মাঝে যেসব বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে সেগুলো সম্পর্কে কোন রূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। তাদের সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করে অথবা তাদের কারও চরিত্র হননের চেষ্টা করে, অথবা গালমন্দ করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা। অনুরূপভাবে নবী পরিবারকে মহব্বত করা, তাদের সাথে মুয়ালাতপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, তাদের সম্মান-মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া, এবং তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকার রক্ষার আরেকটি দিক হচ্ছে, আহলে সুন্নাতের ওলামাদের মুহাব্বত করা, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাদের অসম্মান ও মর্যাদাহানীকর কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মুওয়ালাতের (বন্ধুত্বসুলভ আচরণ) একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, কাফির, মুনাফিক, বেদআতপন্থী ও পথভ্রষ্ট এবং যারা রাসূলের শত্রু ও প্রতিপক্ষ তাদেরকে শত্রুমনে করা।

প্রবৃত্তিপূজারি ও বেদআতপন্থীদের জনৈক ব্যক্তি আইয়ূব সাখস্তিয়ানীকে বললেন: আমি আপনাকে একটি কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং হাতে ইশারা দিয়ে বললেন, এমনকি অর্ধেক কথাও না। আর এটা ছিল রাসূলের সুন্নতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে।

তৃতীয় আসর: মাহে রমাযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ (১)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন: মাহে রমযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শই পরিপূর্ণ অনুসরণীয়, মানযিলে মাকসুদে পৌঁছাতে কার্যকরী ও সকলের জন্য আমলের উপযোগী আদর্শ।

সিয়াম তৃতীয় হিজরীতে ফরয হয়। সে হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র নয় বছর সিয়াম পালনের সুযোগ পেয়েছেন।

ফরয হওয়ার প্রথম পর্যায়ে সিয়াম পালন প্রক্রিয়াটি ছিল খুবই সহজ। ইচ্ছা করলে কোন ব্যক্তি রোযা পালন না করে কোন দরিদ্র ব্যক্তির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেই হয়ে যেত। পরবর্তীতে সিয়াম পালন সকলের উপর অত্যবশ্যকীয় বিধানরূপে আরোপিত হয়। শুধুমাত্র বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে মিসকীন খাওয়ানোর হুকুমটি বলবৎ থাকে।

অবশ্য রোগাক্রান্ত ও মুসাফির ব্যক্তি রোযা না রেখে পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে, এ বিধান এখনও বলবৎ রয়েছে। আর গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনী মহিলা যদি জীবনের ক্ষতির আশঙ্কা করে তবে তাদের জন্যও এ অনুমতি রয়েছে।

তবে তারা যদি স্বীয় সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে, তাহলে কাযা করার সাথে সাথে প্রতি দিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। কেননা তাদের রোযা ছেড়ে দেয়াটা অসুস্থতার কারণে হয়নি। বরং তারা সুস্থই ছিল। এ কারণে মিসকীন খাওয়ানোর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। যেমনটি ইসলামের শুরুতে সুস্থ ব্যক্তির রোযা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল।

ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া

মাহে রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ছিল ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া। জিবরাইল আ. রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন ও তাঁকে পাঠ করতে বলতেন। জিবরাইলের সাক্ষাৎ হলে তিনি দান খয়রাতে প্রবল বাতাসের চেয়ে অধিক দ্রুতগামী হতেন। রমযান এলে তার দানশীলতায় যুক্ত হত আরো নতুন মাত্রা। রমযানে তিনি দান-সদকা, ইহসান, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ও যিকিরে অধিক পরিমাণে নিমগ্ন হতেন।

ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে রমযানকে এমনভাবে বিশেষায়িত করতেন যা অন্য কোন মাসের বেলায় করতেন না। তিনি কখনো সেহরি গ্রহণ করা থেকেও বিরত থাকতেন। উদ্দেশ্য ছিল রাত ও দিনের পুরো সময়টাই ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া।

রাসূলুল্লাহ সাহাবাদেরকে সেহরি গ্রহণ না করে সওমে বিসাল পালন হতে বারণ করতেন। তাদেরকে বলতেন:

لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ" وَفِي رِوايةٍ: "إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسقِينِي" [مُتفقٌ عَليهِ]

আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রিযাপন করি, অন্য এক বর্ণনায়, আমি আমার রবের সান্নিধ্যে থাকি। তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

তিনি উম্মতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সওমে বিসালকে নিষিদ্ধ করেছেন। তবে সেহরির সময় পর্যন্ত রোযা দীর্ঘায়িত করার অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

لَا تُواصِلُوا, فأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُواصِلْ إِلَى السَّحَرِ

তোমরা সওমে বিসাল পালন কর না। যে ব্যক্তি এরূপ করতে চায়,. সে যেন তা কেবল সেহরি পর্যন- করে।

এটি সিয়াম পালনকারীর জন্য অধিক উপযোগী ও সহজ। কেননা এটা তার জন্য রাতের খাবার গ্রহণ করার মতই, তবে সে একটু দেরি করে করছে। অর্থাৎ দিন ও রাতে রোযাদারের জন্য একবার খাবার গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। সেহরীর সময় খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে রোযাদার তার এই খাবারটাকেই রাতের শুরু থেকে সরিয়ে শেষ রাতে নিয়ে গেল মাত্র।

মাহে রমযান শুরু বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ ছিল, তিনি নিশ্চিতরূপে চাঁদ দেখা ব্যতীত, অথবা কোন এক ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতীত মাহে রমযানের রোযা রাখা শুরু করতেন না। একবার ইবনে ওমর রা. এর সাক্ষ্য অনুযায়ী রোযা রাখেন। জনৈক বেদুইন ব্যক্তির সাক্ষীতেও রোযা রেখেছিলেন। এ দুই জনের দেয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই রোযা রাখেন। রাসূলুল্লাহ তাদের দ্বারা সাক্ষ্য প্রদানমূলক বাক্য উচ্চারণ করাননি। তাদের দেয়া সংবাদ যদি কেবলই সংবাদ হিসেবে ধরা হয়, তবে তিনি একজনের দেয়া সংবাদ তথা খবরে ওয়াহেদ কে রমযানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করেছেন। আর যদি বিষয়টিকে সাক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে তিনি সাক্ষ্যদাতাকে সাক্ষ্য সংক্রান্ত শব্দ উচ্চারণ করতে বলেন নি। আর যদি চাঁদ দেখা না যেত অথবা এ ব্যাপারে কারো সাক্ষ্য পাওয়া না যেত, তাহলে শাবান মাস ৩০ দিন পুরো করতেন। ২৯ শাবান দিবাগত রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে চাঁদ দেখা অসম্ভব হলে তিনি পুরো ৩০ দিন হিসেব করে শাবান মাস শেষ করতেন, তারপর রোযা রাখা শুরু করতেন।

মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে, সেদিন তিনি রোযা রাখতেন না। এ ধরনের দিনে রোযা রাখার নির্দেশও তিনি কাউকে দেননি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় তিনি শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করতেন। এটাই হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ও নির্দেশ। এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে তোমরা হিসেব করে ধরে নাও বাক্যটির কোন বৈপরীত্য নেই।

হাদীসে ব্যবহৃত শব্দ (হিসেব করে ধরে নাও) এর অর্থ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে শাবান মাস ৩০ দিন হিসেব করে গণনা করা। বুখারির বিশুদ্ধ বর্ণনাতেও এর সমর্থন মেলে, বুখারিতে এসেছে,

فأكملوا عدة شعبان

(তোমরা শাবান মাসের হিসেব পূর্ণ কর।)

মাহে রমযান সমাপ্তি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ

এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ হচ্ছে,তিনি রমযান শুরুর ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে মানুষকে সিয়ামের আদেশ করতেন, আর রমযান সমাপ্তির ব্যাপারে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন।

ঈদের সালাতের সময় চলে যাওয়ার পর যদি দুই ব্যক্তি চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিত তবে তিনি রোযা ছেড়ে দিতেন এবং অন্যদেরকেও ছেড়ে দিতে বলতেন, এবং পরদিন সময়মত ঈদের সালাত আদায় করতেন।

চতুর্থ আসর: মাহে রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ (২)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সময় হওয়া মাত্রই ইফতার সেরে নেয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতেন, বিলম্ব করতেন না। এবং তিনি সেহরী গ্রহণ করতেন। সেহরী গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। তবে সেহরী বিলম্বে গ্রহণ করতেন। সেহরী বিলম্বিত করার প্রতি তিনি উৎসাহও দিতেন।

তিনি খেজুর দিয়ে ইফতার করতে উৎসাহ দিতেন। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে। উম্মতের প্রতি গভীরতম মমত্ববোধেরই প্রকাশ ঘটেছে রাসূলুল্লাহর এই কর্মপদ্ধতিতে। কেননা ক্ষুধাক্লিষ্ট উদরে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যের প্রবেশ মানবপ্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ। মানুষের দৈহিক শক্তি এতে সতেজ হয়। বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পায়।

মদীনার মিষ্টি দ্রব্য হল খেজুর। খেজুরই মদীনাবাসীদের প্রধান খাদ্য। এটিই তাদের খাদ্য এবং এটিই তাদের তরকারী। এর তাজাগুলো তাদের ফল।

আর পানি দ্বারা ইফতার করার গুরুত্ব এখান থেকে বুঝা যায় যে, রোযা রাখার ফলে কলিজায় একপ্রকার শুষ্কতার সৃষ্টি হয়। শুরুতে, পানি দিয়ে যদি তা ভিজিয়ে নেয়া যায় তাহলে খাদ্য গ্রহণের উপকারিতা পরিপূর্ণ হয়। ক্ষুধা ও পিপাসার্ত ব্যক্তি যদি খাবার গ্রহণের পূর্বে একটু পানি পান করে খাবার শুরু করে তবে এটাই তার জন্য উত্তম। উপরন্তু পানি ও খেজুরের মধ্যে হৃৎপিন্ড সুস্থ থাকার যে উপাদান রয়েছে তা তো হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাই ভাল জানেন।

ইফতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের পূর্বেই ইফতার সারতেন। তিনি সাধারণত গুটি কয়েক খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। খেজুর না পেলে কয়েকটি খোরমা। তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি।

একটি বর্ণনায় এসেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারের সময় বলতেন,

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى

অর্থ: তৃষ্ণা বিদূরিত হল, ধমনি হল সিক্ত, আর পুণ্য সাব্যস্ত হল ইনশাআল্লাহু তাআলা।

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে,

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ {رَواه ابْنُ مَاجَه}

ইফতারের সময় রোযাদারের জন্য এমন একটি দোয়া করার সুযোগ রয়েছে যা কখনো ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

রাত যখন এইদিক দিয়ে আগমন করে এবং ঐ দিক দিয়ে চলে যায়, রোযাদারের তখন ইফতার হয়ে যায়।

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ রাতের আগমনের সাথে সাথে রোযাদার ব্যক্তি বিধানগতভাবে ইফতার করে ফেলেছে বলে ধরে নেয়া হবে যদিও সে নিয়ত না করে । অন্য এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হবে, সে ইফতার লগ্নে প্রবেশ করেছে। أصبح (সকাল করেছে) ও أمسى (সন্ধ্যা করেছে) এর মতই।

সিয়াম পালনকারীর আদব:

রোযাপালনাবস্থায় অশ্লীল কর্মে জড়িত হওয়া, হট্টগোল, গালমন্দ অথবা অপরের গালমন্দের উত্তর দেওয়া থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন। গালাগালকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রোযাদার ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এতটুকু বলতে বলেছেন, إِنِّي صَائِمٌ অর্থাৎ, আমি রোযাদার।

.আমি রোযাদার. কথাটি কীভাবে বলতে হবে সে বিষয়ে ওলামাদের কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়,

-মুখে উচ্চারণ করে বলা, এটাই হাদীসের আপাত ব্যাখ্যা।

-রোযা পালন অবস্থায় রয়েছে, কথাটি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য রোযাদার ব্যক্তি মনে মনে এরূপ বলবে ।

-ফরয রোযার সময় মুখে উচ্চারণ করে বলবে, আর নফলের সময় মনে মনে বলবে, কেননা রিয়ামুক্ত হওয়ার এটা একটা সুন্দর পন্থা।

রমযানে সফর সংক্রান্ত আদর্শ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে সফর করেছেন। সফর অবস্থায় তিনি কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো ইফতার করেছেন, অর্থাৎ রোযা বিহীন অবস্থায় থেকেছেন। আর সাহাবাদেরকে এ দুয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তিনি রোযা ভঙ্গ করার নির্দেশ দিতেন। শত্রুদেরকে মোকাবেলা করার সময় শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশেই তিনি এরূপ করতেন।

তবে যদি সফরে যুদ্ধ-লড়াইয়ের কোন অনুষঙ্গ না থাকত তাহলে রোযা ভঙ্গের ক্ষেত্রে বলতেন, এটা হল রুখসত তথা সুযোগ, যে গ্রহণ করল, ভাল করল। আর যে করল না বরং রোযা রাখল তাতে তার কোন পাপ হবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বড় অভিযানের প্রায় সবগুলোতেই, যেমন, বদর, উহুদ, খন্দক, তাবুক, ফাতহে মক্কা ইত্যাদি।

তবে তিনি কতটুকু পথ অতিক্রম করলে শরীয়তসম্মত সফর হবে এবং রোযাদার ইফতার করতে পারবে, এ ব্যাপারে কিছু নির্ধারণ করেন নি। সফরের দূরত্ব নির্ধারক কোন কিছুই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়।

সাহাবাগণ সফর শুরু করতেন। আর রোযা ভঙ্গ করলে নিজ এলাকা অতিক্রম করে যাওয়ার পর ভঙ্গ করতে হবে, এ জাতীয় কোন শর্ত আরোপ করতেন না। সফরের শুরুতেই নিজ বাড়ি-ঘর অতিক্রম করার পূর্বেই রোযা ভঙ্গ করতেন এবং বলতেন, এটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ।

উবাইদ বিন যাবর বলেন:

قَال عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: رَكِبتُ مَع أَبِي بَصْرةَ الغِفَارِيِّ صَاحِب رَسُولِ اللهِ سَفِينةٍ مِنَ الفُسْطَاطِ فِي رَمضَانَ، فَلَمْ يُجَاوِزِ البُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ وَقَالَ: اقْتَرِبْ. قُلْتُ: أَلسْتَ تَرَى البُيُوتَ؟ قَالَ أَبُو بَصْرةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ؟. [رواه أحمد وأبوداود]

আমি সাহাবী আবু বসরা (রা) এর সাথে ফুসতাত থেকে সফরের উদ্দেশ্যে নৌকোয় আরোহণ করলাম। তিনি নিজ এলাকার ঘর-বাড়ি অতিক্রম করার পূর্বেই দস্তরখান আনার জন্যে বললেন। এবং আমাকে বললেন, কাছে আস। আমি বললাম: আপনি কি এলাকার ঘর-বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন না? আবু বসরা বললেন: তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত উপেক্ষা করতে চাও।

মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেছেন.

أَتَيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفرًا, وَقَد رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُه، وَقَدْ لَبِسَ ثِيابَ السَّفَرِ، فَدَعا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

আমি রমযানে আনাস ইবনে মালেকের কাছে গেলাম, তিনি সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সফরের উদ্দেশ্যে তার বাহন প্রস্তুত করে রাখা ছিল। তিনি সফরের পোশাক পরিধান করলেন। অতঃপর খাবার আনতে বললেন এবং গ্রহণ করলেন। আমি বললাম, এটা কি সুন্নত। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সুন্নত। এরপর তিনি সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন।

এই হাদীসগুলো রমযানে সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি প্রসঙ্গে খুবই স্পষ্ট প্রমাণ।

পঞ্চম আসর: মাহে রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ (৩)

মাহে রমযানে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাতের গোসল না সেরেই সুবহে সাদেক অতিক্রম করেছেন। এবং সেদিন ফজরের আযানের পর গোসল সেরেছেন এবং রোযা রেখেছেন।

রোযা অবস্থায় তিনি কখনো কখনো স্ত্রীদের চুম্বন করতেন, আর এ চুম্বনকে পানি দিয়ে কুলি করার তুল্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

রমযানে ভুল করে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণকারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর আদর্শ

রোযা অবস্থায় ভুল করে কিছু খেলে বা পান করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ হল উক্ত রোযা কাজা না করা। কেননা আল্লাহই ঐ ব্যক্তিকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। এটা ঘুমন্ত অবস্থায় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের মতই। আর ঘুমন্ত ও ভুলকারী ব্যক্তি তাকলীফ বা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ (যেসব বস্তু খাদ্যের বিকল্প হিসাবে ব্যহহার করা হয় তাও এর মধ্যে শামিল যেমন খাদ্যজাতীয় ইনজেকশন) শিঙ্গা লাগানো, ও বমি করা।

আল-কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর মিলনও পানাহারের মত রোযা ভঙ্গের কারণ। এ ক্ষেত্রে কারও কোন দ্বিমত নেই। চোখে সুরমা লাগালে রোযা ভাঙবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে কিছু প্রমাণিত হয়নি। তিনি রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করতেন বলেও বর্ণনায় এসেছে।

ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় মাথায় পানি ঢালতেন, কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। তবে নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা থেকে বারণ করেছেন। রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন বলে কোন প্রমাণনেই। দিনের শুরুতে অথবা শেষভাগে মিসওয়াক থেকে বারণ করেছেন বলেও বিশুদ্ধ সূত্রে কিছু পাওয়া যায় না।

এতেকাফ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন। ওফাত পর্যন্ত তিনি এ নিয়মের অনুবর্তী ছিলেন। একবছর কোন কারণে শেষ দশকের এতেকাফ করতে পারেননি, পরে শাওয়াল মাসে তা কাজা করেছেন। লাইলাতুল কদর তালাশ করতে গিয়ে তিনি একবার রমযানের প্রথম দশকে অতঃপর মধ্য দশকে এরপর শেষ দশকে এতেকাফ করেন। পরবর্তীতে তাকে জানিয়ে দেয়া হল যে, লাইলাতুল কদর শেষ দশকে। এরপর থেকে তিনি ওফাত পর্যন্ত শেষ দশকেই এতেকাফ চালিয়ে গেছেন।

তিনি তাঁবুর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিতেন যা মসজিদে টানানো হত। সেখানেই তিনি আল্লাহর যিকির-আরাধনায় নিবিষ্ট হতেন।

এতেকাফের নিয়ত করলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করতেন ও এতেকাফ শুরু করতেন।

প্রতি বছর দশ দিন করে এতেকাফ করতেন। তবে যে বছর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন সে বছর বিশ দিন এতেকাফ করেছেন।

-জিবরাঈল আ. প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার করে কুরআন পড়া ও পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে আগমন করতেন। তবে তাঁর ওফাতের বছর তিনি দুইবার এ দায়িত্ব পালন করেছেন।
-জিবরাঈল আ. বছরে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কুরআন পড়তেন, তবে ইন্তেকালের বছর দুইবার পড়েছেন।
- এতেকাফের সময় তিনি নির্ধারিত তাঁবুতে একা একা প্রবেশ করতেন।
- এতেকাফ অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।
-মসজিদ হতে আয়েশা (রা.) এর কক্ষে মাথা প্রবেশ করিয়ে দিতেন, আয়েশা (রা) নিজ কক্ষ হতেই হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাথা ধুয়ে দিতেন এবং আঁচড়িয়ে দিতেন।
-এতেকাফে থাকা কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করার জন্য উম্মাহাতুল মুমিনীনদের কেউ কেউ নির্ধারিত স্থানে যেতেন, সাক্ষাত শেষে তিনি উঠে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও দাঁড়াতেন এবং বিদায় দিতেন । আর এ যিয়ারতের ঘটনা সাধারণত: রাতের বেলায় সংঘটিত হত।
এতেকাফ অবস্থায় তিনি কখনোই কোন স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করেননি। এমনকি চুমোও দেননি।
-তিনি ইতিকাফ করতে গেলে বিছানা পেতে দেয়া হত। এতেকাফস্থলে তাঁর খাটও রাখা হত।
- কোন প্রয়োজনে ইতিকাফ স্থল হতে বের হলে, সে কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজ করতেন না। যেমন, কোন রোগীর পাশ দিয়ে যেতেন, কিন্তু তার কাছে যেতেন না, এবং তার সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেসও করতেন ন।
- একবার তিনি একটি তুর্কি তাঁবুতে এতেকাফ করেন। তখন তাঁবুটির প্রবেশপথ পাটি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য যাতে অর্জিত হয় সে জন্যই তিনি এরূপ করেছেন। বর্তমান সময়ের অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। তারা এতেকাফের জায়গাকে আলাপ-চারিতা ও যিয়ারতকারীদের অভ্যর্থনা জানানোর জায়গা বানিয়ে ফেলে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, এসব এতেকাফের রং-রূপ আর নববী এতেকাফের রং-রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ষষ্ঠ আসর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বংশ পরিক্রমা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নসব,
আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাআব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহির ইবনে মালেক ইবনে নাযার ইবনে কেনানাহ ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলয়াস ইবনে মুযার ইবনে নিযার ইবনে মাআদ্দ ইবনে আদনান।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বংশ পরিক্রমা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত। আদনান ইসমাইল আ. এর সন্তান এ প্রসঙ্গেও কোন দ্বিমত নেই।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামসমূহ
যুবাইর ইবনে মুতইম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,
إِنَّ لِي أَسْمَاءَ: أَنَا مُحَمَّدٌ, وَأَنَا أَحْمَدُ, وَأَنَا الماحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ, وَأَنَا الـحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ, وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ. [متفق عليه]

আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে : আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমদ, আমি মাহী আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কুফরকে মুছে দেবেন। আমি হাশের (একত্রিত কারী) আমার পায়ের নিকট মানুষদেরকে একত্রিত করা হবে। আমিই (আকিব) সর্বশেষ আগমন কারী যার পর আর কেউ আসবে না।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَه أَسْمَاءً فَقَال: "أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالـمُقَفِّي وَالْـحاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيّ الرَّحْمَةِ" [رواه مسلم]

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তার অনেকগুলো নাম উল্লেখ করে বলতেন: আমি মুহাম্মদ, আহমদ, আল-মুকাফফা, আল হাশের, আমি তাওবার নবী, আমি রহমতের নবী। {মুসলিম}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মধারার পবিত্রতা

এই বিষয়টি কোন দলীল প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, তিনি গোত্রীয়ভাবে বনী হাশেম এর অন্তর্ভুক্ত ও কোরাইশ বংশ-ধারার। তিনি আরবদের মধ্যে সর্বোত্তম বংশ পরিক্রমার অধিকারী। মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেছেন যা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম জায়গা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: আল্লাহই অধিক জানেন, কোথায় তিনি তার রেসালত রাখবেন।

আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হিরাকলিয়াসের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উচ্চ বংশ মর্যাদা স্বীকার করে বলেছিলেন, তিনি আমাদের মধ্যে উঁচু বংশের অধিকারী। উত্তরে হেরাকলিয়াস বলেছিলেন, রাসূলগণ এরকমই হন। তাঁরা তাদের জাতির উঁচু বংশ ধারায় জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجلَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْراهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ" [رواه مسلم.]

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমের সন্তানদের মধ্যে ইসমাঈলকে মনোনীত করেছেন। আর বনী ইসমাঈলের মধ্যে কেনানাকে বেছে নিয়েছেন, বনী কেনানা থেকে কুরাইশদের বেছে নিয়েছেন। আর কোরেশদের থেকে বনী হাশেমকে। আর বনী হাশেমের মধ্যে হতে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।

তিনি যে পবিত্র বংশের, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মাতা-পিতাকে যিনা-ব্যভিচার কর্মে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি বৈধ ও শুদ্ধভাবে সম্পাদিত বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির ঔরশজাত সন্তান। তিনি বলেন : আমি বিবাহ থেকে বের হয়েছি, যিনা থেকে বের হইনি। আদম থেকে নিয়ে আমার পিতা-মাতা আমাকে জন্মদান পর্যন্ত কোন পর্যায়েই জাহেলী যুগের যিনা ও অশ্লীলতা আমাকে স্পর্শ করেনি । [তাবরানী: আল আওসাত, আলবানী রহ. এই হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: আমি আদম থেকে (নিয়ে শেষ পর্যন্ত), যিনা নয়, বিবাহ থেকে বের হয়েছি।

ইবনে সাদ ও ইবনে আসাকের (র) কালবী রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাঁচ শত মাতার নাম লিপিবদ্ধ করেছি, এঁদের মধ্যে কাউকেই আমি যিনাকারিনী পাইনি। জাহেলী যুগের কোন জিনিসও তাদের কারো কাছে পাইনি। পাঁচ শত মা এর অর্থ মা ও বাবা উভয় পক্ষের দাদী, পরদাদী... ইত্যাদি।

কোন এক কবি বলেন :

مِنْ عَهْدِ آدَمَ لَمْ يَزَلْ تَحْمِي لَهُ   فِي نَسْلِهَا الْأَصْلَابُ وَالْأَرْحَامُ.

حَتَّى تَنَقَّلَ فِـي نِكَـاحٍ طَاهِرٍ   مَا ضَمَّ مُجْتَمِعَيْن فِيهِ حَرَامُ.

فَبَدا كَبَـدْرِ التمِّ لَيْلَةَ وَضْعِهِ   مَا شَانَ مَطْلَعَـهُ المنِيرَ قَتَامُ.

فَانْجَابَتِ الظَّلْمَاءُ مِنْ أَنْوَارِهِ   وَالنُّورُ لَا يَبْقَى عَلَيْهِ ظَلَامُ.

شُكْرًا لمُهْدِيهِ إِلَيْنَا نِعْمَةً   لَيْسَتْ تُحِيطُ بِكُنْهِها الْأَوْهَامُ.

আদম থেকে মায়ের গর্ভ ও বাপের পৃষ্ঠ বংশপরম্পরা তাকে হিফাযত করে এসেছে।
অবশেষে পবিত্র বিবাহের মাধ্যমে আবর্তিত হলেন। তাঁর ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সাথে হারাম কিছু যুক্ত হয়নি।
প্রসবের রাত তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাশ পেলেন। তাঁর আলোকময় উদয়কে অন্ধকার আচ্ছন্ন করতে পারেনি ।
ফলে তাঁর আলোকে অপসারিত হল অন্ধকার। কারণ, আলোর উপর অন্ধকার বিদ্যমান থাকে না।
আমরা শুকরিয়া আদায় করছি সে দাতার, যিনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন এমন এক নিয়ামত, যার মর্ম মানুষের কল্পনা নাগাল পায় না।

সপ্তম আসর: সত্যবাদিতা ও আমানতদারী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই নিজ জাতির কাছে সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারা তাকেঁ আল আমীন বলে ডাকত। এই খেতাবটি কেবল তার জন্যই সুনির্ধারিত ছিল। এর মাধ্যমে এটিই প্রমাণ হয় যে তিনি সত্যবাদিতা আমানতদারীসহ যাবতীয় উত্তম গুণাবলির সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করতে পেরেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারির ব্যাপারে তাঁর শত্রুরাও সাক্ষ্য দিয়েছে। আবু জেহেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মারাত্মকভাবে ঘৃণা ও তাঁকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও সত্যবাদী বলেই বিশ্বাস করত । এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল: মুহাম্মদ সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? উত্তরে সে বলল, ধ্বংস হোক তোমার। আল্লাহর কসম। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সত্যবাদী। মুহাম্মদ কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। কিন্তু যদি কুসাইয়ের সন্তানরা ঝান্ডা, পানি পান করানো, কাবা ঘরের পাহারাদারী ও নবুওয়ত নিয়ে যায় তাহলে কুরাইশের অন্যান্য শাখাগুলোর ভাগে কি রইল ?

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে আবু সুফয়ান নবীর বিরুদ্ধে কঠিন শত্রুতায় লিপ্ত ছিল, সম্রাট হেরাকলিয়াস যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, সে এখন যা বলছে তা বলার আগে, তোমরা কি তাঁকে মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল, না।

হেরাকলিয়াস বলল: আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সে যা বলছে তা বলার পূর্বে তোমরা কি তাঁকে মিথ্যার অপবাদ দিতে, তুমি বললে, না। আমি বুঝতে পেরেছি, যিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী নন তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহর উপর যেদিন প্রথম ওহী নাযিল হয়, তিনি কাঁপতে কাঁপতে খাদিজা (রা.) এর কাছে এসে বললেন, আমাকে কম্বলাবৃত কর। আমাকে কম্বলাবৃত কর। খাদিজা (রা.) বললেন, সুসংবাদ

গ্রহণ করুন। না না। আল্লাহ আপনাকে কখনো অসম্মানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। সত্য কথা বলেন...।

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَـمَّا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء ٢١٤ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى صَعِد الصَّفَا، فَهَتفَ: "يَا صَبَاحاهُ" فَقَالُوا: مَنْ هَذَا ؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: "أَرَأَيْتُم إِنْ أَخْبَرتُكمْ أَنَّ خَيْلاً بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيّ ؟" قَالُوا: نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: "فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِي عَذَابٍ شَدِيدٍ" [متفق عليه]

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন وأنذر عشيرتك الأقربين (তুমি তোমার নিকটজনদের ভীতি প্রদর্শন কর) নাযিল হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং সাফা পর্বতে আরোহণ করে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ইয়া সাবাহাহ! লোকেরা বলল, কে ডাকছে? অতঃপর সকলেই তাঁর কাছে একত্রিত হল। তিনি বললেন, যদি আমি বলি, উপত্যকায় একটি সৈন্য দল তোমাদের উপর হামলা করতে উন্মুখ হয়ে আছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলল, নিশ্চয়ই। আমরাতো আপনাকে কেবল সত্যবাদী হিসেবেই পেয়েছি। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারি মুশরিকদেরকে রীতিমতো বিপদে ফেলে দিয়েছিল যে, তারা তাঁকে কি উপাধিতে খেতাব করবে - তারা একবার বলে জাদুকর, মিথ্যাবাদী। আবার বলে, কবি। একবার বলে, গণক আবার বলে, পাগল। আর তারা এই ক্ষেত্রে একজন অন্যজনকে ভৎসনা করত। কেননা তারা জানত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

নযর ইবনে হারিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে খুবই নির্দয় ছিল। সে একবার কুরাইশদেরকে বলল, হে কোরাইশগণ! তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় পেয়ে বসেছে যা পূর্বে কখনো ঘটেনি। মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে ছিলেন অল্প বয়সী বালক। বুদ্ধিমত্তায় তোমাদের সবার সন্তুষ্টির পাত্র। কথায় সত্যবাদী। তোমাদের মধ্যে সমধিক আমানতদার। অতঃপর যখন তোমরা তার অলকে সাদা চুল দেখতে পেলে, আর সে নিয়ে এল নতুন এক বার্তা, তখন তোমরা তাকে বললে যাদুকর। আল্লাহর কসম, সে যাদুকর নয়। তোমরা তাকে গণক বললে। না, আল্লাহর কসম, সে গণক নয়। তোমরা তাকে কবি বললে, পাগল বললে। এরপর সে বলল, হে কুরাইশগণ! তোমরা তোমাদের বিষয়টা খতিয়ে দেখ। আল্লাহর কসম! খুবই মহৎ এক বিষয় তোমাদের কাছে এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমানতদারী প্রসঙ্গে বলা যায় যে এ মহৎ গুণটিই খাদিজাকে আকৃষ্ট করেছে। রাসূলুল্লাহর স্ত্রী হওয়ার জন্যে তাকে আগ্রহান্বিত করেছে। কেননা সিরিয়ায় ব্যবসা-মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তিনি তার গোলাম মায়সারার কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমানতদারী ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে যা জানতে পেরেছিলেন তা তাকে অভিভূত করেছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমানতদারীর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কুরাইশের মুশরিকরা- কাফির ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও- তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। এ ব্যাপারে তারা নিরাপত্তাবোধ করত। আল্লাহ যখন তার রাসূলকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আলী (রা) কে মক্কায় তাঁর জায়গায় রেখে গেলেন, যাতে তিনি আমানতগুলো হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

সবচেয়ে বড় আমানত যা রাসূল বহন করেছেন ও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে হকদারদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তা হল ওহী ও রেসালতের আমানত যা আল্লাহ তাঁর কাঁধে অর্পণ করেছেন। তিনি এই আমানত মানুষের কাছে অনুপুঙ্খভাবে ও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি দলীল-প্রমাণ, বয়ান-বর্ণনা, যবান, তরবারী সবই ব্যবহার করেছেন শত্রুদের মুকাবিলায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য বিজয় এনে দিয়েছেন। তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য মানুষের হৃদয় খুলে দিয়েছেন। তারা রাসূলের প্রতি ঈমান আনল এবং তাঁকে সত্য বলে জানল, তাঁকে সাহায্য করল। আর এভাবে তাওহীদের বাণী উঁচু হল। ইসলাম পৃথিবী জুড়ে প্রচার পেল। গ্রাম ও শহরের এমন বাড়ি বাকি রইল না যেখানে আল্লাহ এই দীনকে প্রবেশ করাননি।

অষ্টম আসর: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সুসংবাদ ও অঙ্গীকার প্রদান

পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা যা দান করলাম তারপর যখন একজন রাসূল আগমন করবেন, যিনি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান কিতাবের সত্যতা স্বীকার করবেন। তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। বললেন: তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল: আমরা স্বীকার করলাম, তিনি বললেন: তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। অত:পর যে লোক এ ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, তারাই হলো দুষ্কার্যকারী। {সূরা আলে ইমরান:৮১-৮২}

আলী বিন আবু তালেব এবং রাসূলুল্লাহর চাঁচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লহু আনহুমা বর্ণনা করছেন, আল্লাহ তাআলা যে নবীকেই পাঠিয়েছেন তাঁর কাছ থেকেই এ-মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তিনি জীবিত থাকাবস্থায় যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন তাহলে তিনি তাঁর উপর ঈমান আনবেন ও তাঁকে সাহায্য করবেন। সাথে সাথে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে তিনি যেন স্বীয় উম্মতের কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তারা জীবিত থাকাবস্থায় যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেরিত হন তাহলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।

সুদ্দী থেকেও এ মর্মে অনুরূপ একটি বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ তাআলা নবী ইবরাহীম আ. এর ভাষ্য উল্লেখ করে বলেন:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

হে আমাদের রব! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন-যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনাবেন,তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন, নিশ্চয় আপনি মহা-শক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন,
আল্লাহ তাআলা, নবী ইবরাহীম আ. কর্তৃক পবিত্র নগরীর অধিবাসীদের জন্য পরিপূর্ণ দুআর সাকুল্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, আল্লাহ যেন তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে অর্থাৎ ইবরাহীমের বংশধর হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁর এ দুআ আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, উম্মিদের মধ্য হতে তাদের এবং সকল জিন-ইনসানের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণের মাধ্যমে কবুল করেন।
ইমাম আহমদ রহ. সাহাবী ইরবায বিন সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي عِنْدَ اللهِ لَـخَاتَمُ النَّبِيِّينَ, وَإِنَّ آدَمَ لمنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ: دَعوةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيْسىَ بِي، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأتْ، وَكَذلِك أُمَّهاتُ النَّبِيِّين يَرَيْنَ.

আমি আল্লাহ তাআলার নিকট শেষ নবী (হিসেবে নির্বাচিত) আর আদম তখন কাদা-মাটিতে ঘুরপাক খাচ্ছেন। আমি তোমাদেরকে এর প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বলছি: আমার পিতা ইবরাহীমের দুআ, আমার সম্পর্কে নবী ঈসার সুসংবাদ এবং আমার মাতার দেখা স্বপ্ন, নবী জননীগণ এমনি করেই স্বপ্ন দেখে থাকেন।
মানুষের মাঝে ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা চলে আসছিল। এক পর্যায়ে এসে বংশীয়ভাবে বনী ইসরাঈলের শেষ নবী ঈসা আলাইহিসসালাম সর্বশেষ নবীর নাম সরাসরি উল্লেখ করলেন। তিনি বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে এক বয়ানে বললেন।

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
.

আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, পূর্বে নাযিলকৃত তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তার নাম হবে আহমাদ।
এজন্যেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন,আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দুআ এবং নবী ঈসা বিন মারইয়ামের সুসংবাদ।
পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহর যে মর্যাদা ও মাহাত্ম্ আলোচিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত তার প্রমাণ বহন করে।
ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿১৫৭﴾

যারা অনুসরণ করে নিরক্ষর নবীর, যাঁর বর্ণনা তারা নিজেদের কাছে থাকা তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎ কর্ম থেকে, তাদের জন্যে যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে

সাহায্য করেছে,এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।

عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ فِي التَّوْرَاةِ.قَالَ: أَجَلْ وَاللهِ، إِنَّه لموْصُوفٌ في التَّوراةِ بِصِفَتِهِ فِي القُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا [الأحزاب[٤٥ :، وَحِرْزًا للأُمِّيِّينَ, أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي, سَمَّيتُكَ المتَوَكِّلَ, لَيْسَ بِفَظٍّ, وَلَا غَلِيظٍ, وَلَا صَخّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ, وَلَا يُجْزِي بالسَّيِّئَةِ السَّيئةَ, وَلكِنْ يَعفُو وَيغْفِر، ولَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الملَّةَ العَوْجَاءَ؛ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إله إِلّا اللهُ, فَيَفْتَحُ بِه أَعْيُنًا عُمْيًا, وَآذانًا صُمًّا, وَقُلُوبًا غُلْفًا. [رواه البخاري.[

আতা বিন ইয়াসার বলেন: আমি আব্দুলল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করে বললাম, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে যে বিবরণ এসেছে সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ তাওরাতে তাঁর বর্ণনা ঠিক একইরূপে বিবৃত হয়েছে যেভাবে হয়েছে কুরআনে: {হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।}

এবং উম্মী-নিরক্ষরদের আশ্রয়স্থল, আপনি আমার বান্দা ও রাসূল, আপনাকে আমি মুতাওক্কিল (ভরসা কারী) নামে আখ্যায়িত করেছি। তিনি কঠোর হৃদয় নন এবং নির্দয় স্বভাব ও বাজার-ইত্যাদিতে হৈ চৈ কারীও নন, তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দিয়ে নেন না, বরং মন্দের মুকাবিলায় উপহার দেন ক্ষমা ও মার্জনা। বক্র ও গোঁয়ার জাতিকে শিষ্ট ও ভদ্র জাতিতে পরিবর্তিত করা অবধি আল্লাহ তাঁকে পৃথিবী থেকে তুলে নেবেন না অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র উপাস্য স্বীকার করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত তাঁর ইন্তেকাল হবে না। তিনি তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চক্ষু, বোধির কান এবং বন্ধ হৃদয়সমূহকে খুলে দেবেন।

ইমাম বায়হাক্বী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, জারূদ ইবনে আব্দুল্লাহ (রাসূলুল্লাহর নিকট) এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর বললেন, যিনি আপনাকে দীনে হকসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ : আমি আপনার বিবরণ ইঞ্জিলে পেয়েছি এবং আপনার সম্পর্কে ইবনুল বতূল -ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিসসালাম সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّجَاشِيُّ: أَشْهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله, وَأَنَّه الَّذِي بَشَّر بِهِ عِيسى، وَلوْلَا مَا أَنَا فِيه مِنْ أَمْرِ الـمُلْكِ، وَمَا تَحمَّلتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، لَأَتَيْتُه حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْه [رواه أبوداود]

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নাজ্জাশী বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তিনিই সে ব্যক্তি যার সম্পর্কে নবী ঈসা সুসংবাদ দান করেছিলেন। আমাকে যদি জনসাধারণ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে না হতো তাহলে তাঁর জুতা উঠানোর জন্যে আমি তাঁর দরবারে চলে যেতাম।

নবম আসর : দয়া ও রহমতের নবী (১)

নিজ শত্রুদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুকম্পা

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত বিশেষ। এ বিশেষণে বিশেষায়িত করে মহান আল্লহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إنما بعثت رحمة . رواه مسلم

আমি তো রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি।

তাঁর দয়া ও রহমত ছিল মুসলিম অমুসলিম সবার ক্ষেত্রেই ব্যাপক ।

সাহাবী তোফায়েল বিন আমর আদদাওসী যখন নিজ কবীলা দাওসের হেদায়েত প্রাপ্তি নিয়ে একেবারে নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহর নিকট এসে আরজ করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাওস সম্প্রদায় নাফরমানী করছে এবং হক গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট বলুন, তাদের উপর বদ-দুআ করুন।

দরখাস্ত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হয়ে দু হাত ওঠালেন। দৃশ্য দেখে লোকেরা দাওস গোত্রের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে নিঃসংশয় হয়ে গেল। কিন্তু রহমতের নবী দোয়া করে বললেন:

اللَّهُمَّ اهد دوسا وائت بهم.

হে আল্লাহ দাওসকে হেদায়াত দান কর এবং সুপথে নিয়ে আস।

তাদের জন্যে তিনি হেদায়াত ও কল্যাণের দুআ করলেন। ধ্বংস ও বিনাশের দুআ হতে তিনি বিরত রইলেন। কারণ তিনি মানবতার জন্যে শুধু কল্যাণই কামনা করতেন, তিনি তাদের সফলতা ও মুক্তির প্রত্যাশা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে তায়েফ গিয়েছেন। কিন্তু তায়েফবাসী তাঁর এ কল্যাণময় আহ্বান শোনার কথা দূরে থাক, বরং তারা তাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করল। দুষ্ট লোকদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করে দিল, তাঁর গোড়ালিদ্বয় থেকে অজস্র রক্ত ঝরল।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জানতে চাইলাম, আপনার জীবনে উহুদের দিন থেকেও মারাত্মক কোন দিন কি অতিবাহিত হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (হ্যাঁ,) আকাবার দিন তোমার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম। -তাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার আমি পেয়েছিলাম সেটি ছিল খুবই ভয়াবহ- যখন আমি নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালীল বিন আবদে কুলালের সামনে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তার কাছে যা আশা করেছিলাম সেটি পাইনি। তাই দুঃখ ভরা হৃদয় ও বিষন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে আসছিলাম। করনুস সাআলিব নামক স্থানে এসে চৈতন্য ফিরে পেলাম। মাথা উপরে উঠিয়ে দেখি একগুচ্ছ মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি সেখানে জিবরাইলও আছেন। আমাকে ডেকে বললেন, আপনার পালনকর্তা -আপনার কওমের কথা এবং তারা যে উত্তর দিয়েছে- সবই শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। তাদের

ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ করুন। তিনি বলেন, এরপর পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আমাকে ডেকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয় আল্লাহ আপনার জাতির কথা এবং আপনার সাথে তাদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে সবই জানেন। আমি পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা তাই আমাকে আদেশ করুন। আপনি ইচ্ছে করলে তাদের দুই পাশের দুই পাহাড়কে একত্রিত করে দেব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং আমি চাই আল্লাহ তাআলা তাদের ঔরস থেকে এমন সব লোক বের করবেন যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।

এটিই হচ্ছে নববী রহমত, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তঝরা জখম, ভগ্ন হৃদয়, ক্ষত-বিক্ষত অন্তর- সব ভুলিয়ে দিয়েছে এবং এমন অবস্থায় তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে যে তাদের কল্যাণ ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা তিনি করেননি। তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসা এবং সিরাতে মুস্তাকীমের পথ দেখানো ব্যতীত অন্য কিছু ভাবেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন, দশ হাজার যোদ্ধার একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। যারা তাঁকে নির্যাতন করেছিল, দূরে ছুঁড়ে মেরেছিল, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, নিজভূমি হতে অন্যায়ভাবে বের করে দিয়েছিল, তাঁর সাথি - সঙ্গীদের হত্যা করেছিল এবং তাদের দীনকে কেন্দ্র করে নির্যাতন চালিয়েছিল, আজ আল্লাহ তাআলা তাঁকে সেই সব লোকদের উপর কর্তৃত্ব দান করলেন। এ মহান বিজয় সাধিত হওয়ার পর জনৈক সাহাবী বললেন:

اليوم يوم الملحمة

আজ হচ্ছে তীব্র লড়াই ও হতাহতের দিন। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

بل اليوم يوم المرحمة

আজ বরং অনুকম্পা ও দয়া প্রদর্শনের দিন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব পরাভূত লোকদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাদের চক্ষু হয়ে গিয়ে ছিল ছানাবড়া, গলা বুক গিয়েছিল শুকিয়ে এবং অন্তরাত্মা হয়ে গিয়ে ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। যারা অপেক্ষা করছিল এ বিজয়ী নেতা তাদের সাথে কী ধরনের আচরণ করেন, তাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা দেখার জন্যে। তারা তো সে জাতি যারা প্রতিশোধ গ্রহণ ও গাদ্দারিতে ছিল সিদ্ধহস্ত যেমনটি করেছিল উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করব বলে তোমাদের ধারণা, তারা বলল, ভাল ও সুন্দর আচরণ। তুমি সম্মানিত ভাই ও সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র।তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যাও, তোমরা সকলেই মুক্ত। তারা চলে গেল, দেখে মনে হচ্ছিল তারা সবেমাত্র কবর থেকে উত্থিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থ ই বলেছেন:

إنما أنا رحمة مهداة.

নিশ্চয় আমি উপহারস্বরূপ প্রদত্ত রহমত।

দশম আসর: দয়া ও রহমতের নবী (২)

জীব-জন্তু ও জড়পদার্থের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া-অনুকম্পা মুসলিম- অমুসলিম সকলের জন্য ব্যাপ্ত ছিল, বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এবার আমরা আলোচনা করব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়া-মমতার আরও বিস্তৃত পরিধি নিয়ে। অর্থাৎ তাঁর এ অনুকম্পা শুধুমাত্র মানব জাতি পর্যন্ত সীমিত ছিল এমন নয়, বরং তা জীব-জন্তু ও জড়পদার্থকেও শামিল করেছে চমৎকারভাবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, পথিমধ্যে কঠিন পিপাসায় আক্রান্ত হয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি কূপের সন্ধান পেল। সে তাতে নেমে পানি পান করে বের হয়ে এসে দেখতে পেল একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে আর কাদামাটি খাচ্ছে। লোকটি নিজ মনে বলল: পিপাসার কারণে কুকুরটির তেমন কষ্টই হচ্ছে যেমনটি হয়েছিল সামান্য আগে আমার। এ চিন্তা করে সে কূপে অবতরণ করে নিজ মৌজা পানি ভর্তি করল এরপর পানি ভর্তি মৌজা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে উঠে আসল।এবং পানি কুকুরকে পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এ কাজ পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবাগণ জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব জন্তু-জানোয়ারের মাঝেও কি আমাদের জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: প্রাণ স্পন্দন আছে এমন প্রতিটি বস্তুতেই ছাওয়াবের ব্যবস্থা আছে।

এই ব্যাপক অর্থবোধক নীতিবাক্যের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর তাবৎ পশুসম্পদ প্রতিরক্ষা পরিষদ ও সংস্থা যারা পশুকুলের প্রতি মমত্বপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করণ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে পিছনে ফেলে শীর্ষ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরং সেদিন হতেই তাদের থেকে শত-সহস্র বছরের পথ এগিয়ে রয়েছেন যেদিন তিনি বলেছেন :

জনৈকা নারী একটি বিড়ালের কারণে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে, সে ঐ বিড়ালটি মৃত্যু অবধি বন্দি করে রেখেছিল, ফলে সেই নারীকে ঐ বিড়ালের কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। বন্দি করে সে তাকে খেতে ও পান করতে দেয়নি। এবং মুক্ত করে দেয়নি যে পড়ে থাকা আবর্জনা কুড়িয়ে খাবে।

এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য, তাঁর সাহাবীদের জীব-জন্তুর প্রতি যত্নশীল ও দরদি করে তোলা এবং সংগত কারণ ছাড়া জীব-জন্তু হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ যার কারণে হত্যাকারীকে জাহান্নামে যেতে হবে মর্মে বিধান বর্ণনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীব-জন্তু সংক্রান- এ বিধিমালা প্রদান করেছেন সেই কবে, অথচ বর্তমান যুগের মানব রচিত বিধিমালা বিষয়টি সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা কারণে জন্তু হত্যা থেকে বিরত থাকার জন্যে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। বলেছেন:

কেউ চড়ুই বা তদুর্ধ্ব কোন পাখি নাহকভাবে হত্যা করলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। প্রশ্ন করা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তার হক কি? বললেন: তার হক হল, জবাই করা অতঃপর খাওয়া। মস্তক ছিঁড়ে তাকে ছুঁড়ে না মারা । পশু-পাখি জবাই করার সময় জবাই প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা এবং দয়া ও মমতাপূর্ণ আচরণের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

তিনি বলেছেন:

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুতে ইহসানকে ফরয করেছেন, অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে সুন্দরভাবে করবে আর যখন জবাই করবে মমতার সাথে-সুন্দরভাবে জবাই করবে, এবং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন (জবাইয়ের পূর্বে) নিজ ছুরি ধার দিয়ে নেয় এবং জবাইকৃত জন্তুকে যেন আরাম দান করে।

কতিপয় আলেম বলেছেন: জবাইর ক্ষেত্রে ইসলামের এ সুন্দরতম ও মানবতাপূর্ণ রীতি দেখে অনেক পশ্চিমা লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। ইসলাম যে সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ দীন এটি তারই প্রমাণ বহন করে।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন:

لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا . (متفق عليه)

প্রাণ আছে এমন কোন বস্তুকে তোমরা নিশানা হিসাবে ব্যবহার কর না।

অর্থাৎ তিরন্দাজি প্রশিক্ষণকালে কোন জীবকে নিশানা হিসেবে স্থাপন করো না। কেননা এরূপ করা দয়া ও অনুকম্পা পরিপন্থী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম মিশন ছিল সব জায়গা থেকে সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়ন দূর করা, এমনকি জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও তাঁর এ প্রচেষ্টা ছিল দুর্বার। এসব কাজে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জনৈক আনসারী সাহাবীর খেজুর বাগানে তাশরীফ রাখলেন। সেখানে একটি উট বাধা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে সে শব্দ করে কেঁদে উঠল, এতে তার দু গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। রাসূলুল্লাহ উটের নিকটে এলেন এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। উট শান্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এ উটের মালিক কে?

এক আনসারী যুবক এসে বলল: আমি, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ বললেন:

ألا تتقي الله في هذه البهائم التي ملكك الله إياها ؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه و تدئبه.

এসব জীব-জন্তু আল্লাহ তাআলা যেগুলো তোমার মালিকানায় দিয়েছেন, এ সবের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করনা? সে এসে আমার নিকট অভিযোগ করল : তুমি তাকে খেতে দাও না এবং লাগাতার কাজে খাটিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছ।

এ রহমতে মুহাম্মদী থেকে কেউই বঞ্চিত হয়নি। জিন-ইনসান থেকে শুরু করে জীব-জন্তু পর্যন্ত সমানভাবে তাঁর দয়া-অনুকম্পা উপভোগ করে গেছে, এমনকি জড় পদার্থও মুহাম্মাদী অনুকম্পায় তাদের পরিপূর্ণ হিস্‌সা বুঝে পেয়েছিল।

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন:

নবীজীর জন্যে মিম্বার তৈরি করা হলে, যে খেজুর বৃক্ষের উপর তিনি খোতবা দিতেন সেটি ছোট শিশুর মত কান্না জুড়ে দিল। অবস্থা দেখে তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি শান্ত্বনা প্রদত্ত শিশুর ন্যায় বিলাপ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে আগে যিকির-আযকার এবং ওয়াজ নসিহত শ্রবণ করত সে দুঃখে এখন কাঁদছে।

আল্লামা হাসান রহ. যখন এ হাদীসের আলোচনা করতেন খুব কাঁদতেন আর বলতেন: হে মুসলিমবৃন্দ, একটি কাঠ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের আগ্রহে কাঁদতে পারে তাহলে তোমরা তাঁর প্রতি আরো আগ্রহী হওয়ার অধিক উপযোগী।

এগারতম আসর: নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি ও মর্যাদা

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের গুণ ও মর্যাদা অনেক, তিনি ছিলেন অসংখ্য মহৎগুণের অধিকারী। নিচে আমরা তাঁর অসংখ্য গুণাবলী হতে সামান্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

(১) উত্তম চরিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণ।

এ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই প্রশংসা করে বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ .

আর অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . رواه الطبراني

নিশ্চয় আমি মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি। {তাবরাণী}

(২) নিজ উম্মত ও সকল মানবতার জন্যে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা, দয়া ও অনুকম্পা।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ .

আর আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্যে কেবল রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।

আরো ইরশাদ হয়েছে:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.

তিনি ছিলেন মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্যে কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যেত।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলছেন:

إنما أنا رحمة مهداة

নিশ্চয় আমি উপহার স্বরূপ প্রদত্ত রহমত বিশেষ।

(৩) জন্ম থেকেই তাঁর প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধান।

ইরশাদ হয়েছে:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى .

তিনি কি তোমাকে এতীম রূপে পাননি ? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর বক্ষ উন্মুক্ত করা এবং তাঁর আলোচনা সুউচ্চ করা।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি ? আমি কি লাঘব করেনি তোমার বোঝা, যা তোমার পৃষ্ঠকে ভেঙে দিচ্ছিল এবং আমি তোমার চর্চা ও আলোচনাকে করেছি সুউচ্চ।

(৫) তাঁর বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে তিনি হচ্ছেন নবী পরম্পরা পরিসমাপ্তকারী - শেষ নবী।

ইরশাদ হয়েছে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ .

মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে একটি ঘর নির্মাণ করল এবং নির্মাণকর্ম খুব সুন্দর ও পরিপূর্ণ রূপে সমাপ্ত করল, তবে ঘরের এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। লোকেরা ঘর প্রদক্ষিণ করতে লাগল এবং নির্মাণশৈলী দেখে খুব বিস্মিত হল এবং বলল, ঐ খালি স্থানে ইট লাগাচ্ছ না কেন ? তোমার ঘর পূর্ণতা পেত। আমিই হচ্ছি সেই ইট।

(৬)সকল নবী-রাসূলদের উপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান ।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

ছয়টি দিক থেকে সকল নবীদের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে জাওয়ামিউল কালিম তথা ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, আমাকে রোব (ভক্তি-মাখা-ভীতি) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, গনীমতের মাল (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ) আমার জন্যে বৈধ করা হয়েছে, আমার জন্যে সকল ভূমিকে পবিত্র ও সেজদার উপযুক্ত করা হয়েছে, আমি সকল মানুষের তরে প্রেরিত হয়েছি এবং আমার মাধ্যমে নবুওয়ত পরম্পরা শেষ করা হয়েছে।

(৭) তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বড় মুত্তাকি ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব, আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুক সৃষ্টি করলেন অতঃপর তাদের মধ্যে যারা উত্তম আমাকে তাদের সাথে রাখলেন। এরপর তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করলেন আর আমাকে উত্তম দলের সাথে রাখলেন। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন বংশে বিভক্ত করলেন আর আমাকে তাদের উত্তম বংশের সাথে রাখলেন। অতঃপর তাদেরকে ঘরে ঘরে বিভক্ত করলেন আর আমাকে তাদের উত্তম ঘরের মধ্যে রাখলেন। সুতরাং আমি তোমাদের থেকে ঘর ও ব্যক্তি উভয় দিক থেকে উত্তম।

(৮) তিনি কেয়ামতের দিন হাউজ ও শাফাআতের মালিক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

আমি হাউজে (কাউসারে) তোমাদের পূর্বে উপস্থিত হয়ে তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। তোমাদের কতিপয় লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। এক পর্যায়ে আমি যখন তাদেরকে চিনে নেব তাদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে। আমি বলব: হে রব, আমার সাহাবীবৃন্দ ! তখন বলা হবে, আপনার জানা নেই তারা আপনার ইন্তেকালের পর কি কি (বেদআত) আবিষ্কার করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন:

নিশ্চয় প্রত্যেক নবীকেই বিশেষ একটি দুআ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, তাঁরা সেটি করে ফেলেছেন এবং তা কবুলও করা হয়েছে। আর আমি আমার দুআটি কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্যে বিলম্বিত করেছি।
(৯) কেয়ামত দিবসে তিনি মানবকুলের নেতা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:
কেয়ামতের দিন আমি সকল আদম সন্তানের নেতা। এতে কোন গর্ব-অহংকার নেই। সেদিন আমার হাতে প্রশংসার ঝান্ডা থাকবে তাতে কোন গর্ব-অহংকার নেই। আদম থেকে নিয়ে যত নবী-রাসূল আছেন সকলেই আমার ঝান্ডার নীচে থাকবেন। আমি হচ্ছি প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে। এতে কোন গর্ব-অহংকার নেই।
(১০) কেয়ামতের দিন তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:
জান্নাতের দরজায় আমিই সর্বপ্রথম করাঘাত করব, তখন খাযেন (প্রহরী) জিজ্ঞেস করবে: কে আপনি ? আমি বলব: মুহাম্মাদ। সে বলবে: উঠছি এবং আপনার জন্যেই খুলে দিচ্ছি। আপনার পূর্বে কারো জন্যে উঠব না, এবং আপনার পরেও আর কারো জন্যে দাঁড়াব না।
(১১) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাতের আশা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রত্যাশা করেন তিনি তাদের সকলের জন্যে উত্তম আদর্শ।
ইরশাদ হয়েছে:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ...

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।
(১২) তিনি মনগড়া ও প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বরং দীন ও শরীয়ত সংশ্লিষ্ট তাঁর সকল কথা ও বাণী আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী যা কোন বাতিলের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।
ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿٤﴾.

এবং তিনি নিজ খেয়াল-খুশি মোতাবেক কথা বলেন না। ইহা তো ওহী বৈ অন্য কিছু নয়, যা প্রত্যাদেশ করা হয়।

বারতম আসর: জন্ম, দুগ্ধ পান এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিন জন্ম গ্রহণ করেন। রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার জন্ম গ্রহণ করেছেন এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি একমত হলেও কোন তারিখ, এ বিষয়ে তাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন : দুই তারিখ। কেউ বলেছেন, আট তারিখ। আবার কারো কারো মতে, দশ তারিখ। আবার অনেকে বলেছেন, বারোই রবিউল আউয়াল।
আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে তিনি হাতির ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বছর জন্ম গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইবরাহীম ইবনুল মুনযির ও খলীফা বিন খাইয়াত প্রমুখ এ ব্যাপারে ওলামাদের ইজমা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

বিজ্ঞ ঐতিহাসিকবৃন্দ বলেছেন,

নবী মাতা আমেনা তাঁকে গর্ভে ধারণ প্রসঙ্গে বলেন, তার কারণে আমি কোন ভার অনুভব করিনি। যখন ভূমিষ্ঠ হল তার সাথে একটি নূর (আলো বিশেষ) বের হয়ে আসল আর প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য সব আলোকিত হয়ে গেল।

ইবনে আসাকির ও আবু নুআইম সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করে ধরা পৃষ্ঠে আগমন করার পর দাদা আব্দুল মোত্তালিব একটি মেষ জবাই করে আকীকা দিলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন, মুহাম্মাদ। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আবুল হারেছ! বাপ-দাদাদের রীতি ভঙ্গ করে তার নাম মুহাম্মাদ রাখার হেতু কি ? কি কারণে এ বিষয়ে আপনি উৎসাহী হলেন ? উত্তরে তিনি বললেন, আমার আশা, আল্লাহ যেন আকাশে তার প্রশংসা করেন এবং পৃথিবীতে মানুষের নিকটও যেন সে সমধিক প্রশংসার পাত্র হয়, সকলেই যেন তার প্রশংসা করে।

পিতার ইন্তেকাল

মাতৃ গর্ভে থাকাবস্থায়ই তাঁর পিতা পৃথিবী ত্যাগ করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর আগমনের কয়েক মাস পরে ইন্তেকাল করেছেন। প্রথম মতটিই প্রসিদ্ধ।

দুগ্ধ পান

জন্মের পর পর আবু লাহাবের বাঁদি ছুয়াইবীয়াহ কিছু দিন তাঁকে দুগ্ধ পান করান। কিন্তু শিশু মুহাম্মাদকে উপলক্ষ্য করে আবু লাহাব খুশিতে নিজ বাঁদি ছুয়াইবীয়াহকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর বনী সাআদ গোত্র থেকে ধাত্রীর ব্যবস্থা করা হয়। হালীমা সাদিয়া নাম্নী জনৈকা পুণ্যবতী নারী তাঁকে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। বনী সাআদ গোত্রে হালীমা সাদিয়ার নিকট তিনি প্রায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন। সেখানেই তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ-কর্ম সংঘটিত হয়। ফেরেশতারা তাঁর পবিত্র অন্ত:করণ বের করে ধৌত করেন। এবং তাঁর প্রবৃত্তিতে শয়তানের নির্ধারিত হিস্সা বের করে নিয়ে আসেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশেষ নূর, প্রজ্ঞা, অনুকম্পা ও রহমত দ্বারা পূর্ণ করে দেন। এরপর ফেরেশতারা তাঁকে স্বস্থানে রেখে আসেন।

এ ঘটনা সংঘটিত হবার পর হালীমা তাঁর ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাই তাঁকে মা আমেনার কাছে ফেরত দিয়ে আসেন এবং ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তাকে শুনান। ঘটনা শুনে মা আমেনা শঙ্কিত হননি।

আল্লামা সুহাইলী বলেন,

এ পবিত্রকরণ কর্মটি মোট দুবার সংঘটিত হয়েছে।

প্রথমবার: শিশু বয়সে, যাতে তাঁর অন্তরাত্মা শয়তানের দোষ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

দ্বিতীয়বার: যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে আকাশস্থ ফেরেশতাদের নিয়ে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে নিজ পবিত্র সান্নিধ্যে উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করলেন। এ সময় তাঁকে অন্দর ও বহির উভয় দিক থেকে পবিত্র করা হয় এবং তাঁর হৃদয় ঈমান ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়।

মাতৃ বিয়োগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয় বছর বয়সে উপনীত হলে মাতা আমেনা তাঁকে নিয়ে মদীনা মুনওয়ারায় বনী দাউই বিন নাজ্জারে তাঁর নানা-মামাদের যিয়ারতে গেলেন। তাদের সাথে উম্মে আইমানও ছিলেন। সেখানে তিনি একমাস অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মক্কা বিজয় অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবওয়া অতিক্রম করার সময় আল্লাহর তাআলার নিকট তাঁর মাতার কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা করলে আল্লাহ অনুমতি

প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ নিজে খুব কেঁদেছেন, সাথে থাকা সাথীদেরকেও কাঁদিয়েছেন। এবং ইরশাদ করেছেন:

زوروا القبور، فإنها تذكر الموت (رواه مسلم)

তোমরা কবর যিয়ারত কর কারণ এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মাতৃ বিয়োগের পর বাবা থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত বাঁদি উম্মে আইমান তাঁকে কোলে তুলে নেন। আর দাদা আব্দুল মুত্তালিব লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বয়স আট বছর হলে দাদাও পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তবে চাচা আবু তালিবকে তাঁর ব্যাপারে অসিয়ত করে যান। আবু তালিব দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরিপূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে যান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করার পর যথাসম্ভব সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। জীবনবাজী রেখে তিনি রাসূলকে সহায়তা দিয়েছেন। তবে এতকিছুর পরও নিজে শিরকের বেড়াজাল ছিন্ন করে বের হয়ে আসতে পারেননি বরং শিরকের উপরই মৃত্যু বরণ করেছেন। হ্যাঁ... ইসলাম ও মুসলমানদের সহায়তা এবং রাসূলের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে আল্লাহ তাআলা তার শাস্তি বেশ শিথিল করবেন এবং জাহান্নামের সব চেয়ে সহজ শাস্তি দিবেন। এ প্রসঙ্গে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

জাহেলী পঙ্কিলতা থেকে আল্লাহ তাআলার সংরক্ষণ

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সেই শিশুকাল থেকেই বিশেষ যত্ন সহকারে তত্ত্বাবধান ও হেফাযত করেছেন। এবং জাহেলী যুগের নানাবিধ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র রেখেছেন। তাঁর মধ্যে প্রতিমা ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ফলে কখনই তিনি মূর্তি পূজা করেননি। প্রতিমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি। কোন প্রকার শরাব পান করেননি। কুরাইশ যুবকদের সাথে মিশে কোন অন্যায় ও পাপ-কর্মে জড়িত হননি। বরং সর্ব প্রকার দোষ ও গুনাহর কাজ থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। যাবতীয় সুন্দর গুণাবলী ও অভিজাত কর্মাবলী তাঁর প্রকৃতিতে প্রথিত করে দেয়া হয়েছিল। বরং তাঁর এ উন্নত আখলাক, সততা, চরিত্র মাধুরী ও মনোহারী ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা তাঁর নামই দিয়েছিল আল-আমীন। আর এ নামেই তিনি ছিলেন সকলের নিকট সমধিক পরিচিত। তাঁর বিচার-ফয়সালা সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিত, তাঁর মতামত সমর্থন করে নিজেদের দাবি-দাওয়া থেকে সরে আসত। হাজরে আসওয়াদ স্বস্থানে পুন:স্থাপনকে কেন্দ্র করে যে বিশৃঙ্খলা দানা বেধে উঠেছিল সে সময় তাঁর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বিষয়টিকে সুরাহা করে দেয়। কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণকালে হাজরে আসওয়াদ স্বস্থানে কে রাখবে এ নিয়ে তাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সংঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি হয় এবং অশান্তির আগুন জ্বলে উঠার উপক্রম হয় তখন সকলে তাঁকে এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যে বিচারক নির্বাচন করে। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন সকলে মেনে নেবে বলে একমত হয়। উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি একটি বড় চাদর বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ তাতে রাখার নির্দেশ দিলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের লোকদের চাদরের চারিদিক থেকে ধরতে বললেন। এরপর পাথরটি নিজ হাতে নির্ধারিত জায়গায় স্থাপন করে দিলেন। তাঁর এ অভিনব সিদ্ধান্ত দেখে সকলে বিস্ময়াভিভূত হল এবং সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিল। এবং একটি বিরাট সজ্ঘর্ষ থেকে সকলে নিষ্কৃতি পেল।

তেরতম আসর: বিবাহ

পঁচিশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চেয়ে প্রায় পনের বছরের বড় চল্লিশ বছর বয়সী খাদিজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের ইতিবৃত্ত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজার হয়ে তারই গোলাম মাইসারাকে নিয়ে সিরিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমন করেন। পূর্ণ সফরে মাইসারা খুব কাছ থেকে তাঁর মহৎ গুণাবলি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করে, ফলে তাঁর সততা, আমানতদারী, নিষ্ঠা, কর্ম তৎপরতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক মাধুর্য দেখে অভিভূত হয়ে যায়। সফর শেষে নিজ মালকীন খাদিজাকে সব খুলে বললে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং বান্ধবীর মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান। তিনি নিজ গুরুজনদের সাথে পরামর্শের পর প্রস্তাব গ্রহণ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান।

খাদিজা রাদিয়াল্লহু আনহা হিজরতের তিন বছর পূর্বে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন সে সময় রাসূলুল্লাহর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। এরই মাঝে তিনি নবীজীর সাথে পঁচিশ বছরের সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করেন, তিনি জীবিত থাকাবস্থায় নবীজী আর কোন নারীকে বিবাহ করেননি।

তাঁর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ বহু হিকমত ও নানাবিধ মহৎ উদ্দেশ্যে একাধিক নারীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। রাসূলুল্লাহর বৈবাহিক জীবনের এ প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জানার পর একজন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ বলতে বাধ্য হবেন যে, বিভিন্ন প্রাচ্যবিদরা তাঁর সম্পর্কে যে অশালীন মন্তব্য করেছে -যেমন তিনি একজন কামবাদী ও নারী লোভী মানুষ ছিলেন- তাদের এসকল কথা সর্বৈব মিথ্যা ও অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত। তাদের কথা সত্য কি করে হয়!? পঁচিশ বয়সের একজন পরিপূর্ণ যুবক তার থেকে পনের বছরের বড় একজন প্রৌঢ়া নারীকে বিবাহ করে দীর্ঘ পঁচিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, তার মৃত্যু অবধি অন্য কাউকে বিবাহ করেননি।

পরে যখন যৌবন শেষ হল এবং কাম তাড়না বিদায় নিল তখন গিয়ে বিবাহ করলেন। তাহলে এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর তাড়না ও চাহিদা কি নির্বাপিত ও নিস্তব্ধ ছিল(!) অতঃপর পঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ একসাথে সব জেগে উঠল(!)? কোন ন্যূনতম বিবেক সম্পন্ন মানুষ এসব কথা মুখেও আনতে পারে না।

মজার ব্যাপার হচ্ছে অনেক পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী ও গবেষকরাও এসব অসার কথা পরিহাস ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইটালীয় গবেষক ড. লূরা ফিশিয়া ফ্যাগলীরী বলেন:

মুহাম্মাদ দীর্ঘ যৌবনে - যখন জৈবিক চাহিদা ও কাম তাড়না বিদ্যমান থাকে শক্তিশালী আকারে, উপরন্তু তিনি বসবাস করতেন এমন একটি সমাজে (ইসলাম পূর্ব আরব্য সমাজ) যেখানে বিবাহ-শাদী, নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন সামাজিক কর্ম হিসাবে ছিল অনুপস্থিত বা প্রায় বিলুপ্ত, আর একাধিক স্ত্রী থাকা ছিল একটি সর্ব-স্বীকৃত নিয়ম। তালাক বিচ্ছেদ ছিল সবচে সহজ কাজ - এ সময় একজনমাত্র নারী ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করেননি। যাকে বিবাহ করেন তিনি ছিলেন যুবক মুহাম্মাদ থেকে বয়সে অনেক বড়-খাদিজা। দীর্ঘ পঁচিশটি বছর একমাত্র তার স্বামী হিসেবেই কাটিয়ে দিয়েছেন, এর মাঝে আর কাউকে বিবাহ করেননি। বিবাহ করেছেন খাদিজার ইন্তেকালের পর যখন বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করেছিল।

তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেকটি বিবাহের পেছনেই সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ ছিল।

যেমন, তিনি যাদেরকেই বিবাহ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন স্বতন্ত্রভাবে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সকল নারীদের মধ্য হতে, বিবাহের জন্যে তাদের নির্বাচিত করার মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাকওয়া সংশ্লিষ্ট নারীদের সম্মানিত করা। অথবা বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, যাতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্য-নতুন পথ বের করা যায়।

এছাড়া কেবলমাত্র আয়েশা - রাদিয়াল্লহু আনহা - ব্যতীত যত নারী মুহাম্মাদ বিবাহ করেছেন কেউই কুমারী ছিলেন না এবং যুবতীও না। এইটি কি কামুকতা ছিল? এর নাম কি নারী লিপ্সা?

তিনি ছিলেন (রক্ত মাংসে গড়া) মানুষ। তিনি কোন ইলাহ ছিলেন না। ছেলে সন্তানের প্রতি আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। খাদিজার গর্ভে জন্ম-নেয়া তাঁর সকল ছেলে শিশু বয়সে মারা যায়। তাই ছেলে-সন্তানের প্রতি মোহই তাঁকে নতুন ভাবে বিবাহ করতে আগ্রহী করে থাকতে পারে।

এছাড়াও অনেক কারণ থাকতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহৎ একটি পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এতদ সত্ত্বেও তাঁদের মাঝে পূর্ণাঙ্গ সমতা বজায় রেখেছিলেন সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে। তাদের কারো প্রতিই তিনি চুল পরিমাণ পার্থক্য করেননি কখনো।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী নবী যেমন মূসা ও অন্যান্যদের অনুসরণ করে বহু বিবাহ করেছেন। কিন্তু কেউই তাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা সমালোচনা করেনি, তাহলে আমরা তাদের দৈনন্দিন জীবনাচার সম্পর্কে অজ্ঞ আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অবহিত বলেই কি এত সমালোচনা?

তাঁর সহধর্মিণীবৃন্দ

খাদিজা রাদিয়াল্লহু আনহার ইন্তেকালের পর তিনি আরো দশজন মহীয়সী নারীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সর্ব প্রথম সাওদা বিনতে যামআহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন, এর পর আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লহু আনহাকে, তিনি ব্যতীত আর কোন কুমারী নারী রাসূলুল্লাহর জীবনে আসেনি। অতঃপর হাফসা বিনতে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লহু আনহাকে, এরপর যয়নব বিনতে খুযাইমা বিন হারেছকে, এরপর উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে উমাইয়াকে, অতঃপর যয়নব বিনতে জাহশ, জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ এবং উম্মে হাবীবাকে, খায়বর বিজয়ের পর পর বিয়ে করেন সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াইয়কে, সর্বশেষ মায়মূনা বিনতে হারেছকে আর তিনিই হচ্ছেন বিবাহের দিক থেকে রাসূলুল্লাহর সর্বশেষ সহধর্মিণী।

চৌদ্দতম আসর: নবী ও নারী (১)

ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বুলি : ইসলাম নারীর উপর জুলুম করেছে, তাদেরকে শোষণের পাত্র বানিয়েছে, অধিকার বঞ্চিত করেছে। সর্বোপরি তাদেরকে পুরুষদের সেবক ও ভোগের পণ্যে পরিণত করেছে।

বস্তুত নারীর মর্যাদা, সম্মান। নারীর মতামতের গুরুত্ব, তার সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার, সর্ব ক্ষেত্রে তার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করণ ও যথাযথ প্রাপ্য প্রদান করার যে সকল নির্দেশ ও উপদেশ বাণী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-থেকে বর্ণিত হয়েছে তা সমালোচকদের মিথ্যাচারকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে।

আরবরা স্বভাবগতভাবেই ইসলামপূর্ব যুগে মেয়েদের অপছন্দ করত, তাদেরকে অপমান ও লজ্জার বিষয় বলে গণ্য করত। কোথাও কোথাও মেয়েদের জীবিত দাফন করার ঘটনাও ঘটেছে। পবিত্র কুরআন যার চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿النحل:٥٩﴾

তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হলে মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে, সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট।

সে যুগে স্বামী মারা গেলে সন্তান ও নিকট আত্মীয়রা স্ত্রীদের উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক বনে যেত। তাদের ইচ্ছা হলে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিত, তা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই আটকে রাখত। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ইনসাফপূর্ণ বিধান প্রণয়ন করে এ সকল কুসংস্কার থেকে মানব সমাজকে পরিশুদ্ধ করেছে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
নারীরা পুরুষের সহোদরা, তাদের ভগ্নিসদৃশ।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামে নারী-পুরুষের মাঝে কোন বৈষম্য নেই। ইসলামের দুশমনরা যেমনটি তুলে ধরতে সদা তৎপর। বরং ইসলামে আছে নারী পুরুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও একে অন্যকে পূর্ণতাদানের সম্পর্ক।
পবিত্র কুরআন ঈমান, আমল ও প্রতিদানের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে বিধান রচনা করে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿الأحزاب৩৫﴾
নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়ামপালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী- এদের জন্যে আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿غافر/المؤمن৪০:﴾
কেউ মন্দ আমল করলে সে শুধু তার আমলের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মুমিন হয়ে সৎ আমল করবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তারা অসংখ্য রিযিক পাবে।
এ ছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর প্রতি তাঁর মহব্বতপূর্ণ মনোবৃত্তির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :
তোমাদের এ পার্থিব জগৎ হতে আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর সালাতের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রেখে দেয়া হয়েছে। নারীর প্রতি এ মহব্বত ও ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় যিনি বহন করেছেন, তাঁর পক্ষে কখনো সম্ভব নয় নারীর প্রতি জুলুম করা, তাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করা, তাদের শোষণ-জ্বালাতনের পাত্রে পরিণত করা।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের অপছন্দ করা ও তাদের জীবিত দাফন করার কুপ্রথা শুধু রহিতই করেননি, এর বিপরীতে বরং মেয়েদের যথার্থভাবে লালন-পালন, শিক্ষাদান এবং তাদের সাথে মমতাপূর্ণ আচরণ ও সদ্ব্যবহার ইত্যাদির প্রতি খুবই তাগিদ করেছেন। তিনি বলেছেন:

যে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দুই জন মেয়ের লালন পালনের দায়িত্ব পালন করবে কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এভাবে উত্থিত হব- তিনি হাতের আঙুলগুলো জড়ো করে দেখালেন।
অর্থাৎ সে ব্যক্তির মর্যাদা খুব ঊর্ধ্বে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অতি নিকটবর্তী। যার একমাত্র কারণ, মেয়েদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা এবং সাবালক ও নিজের পায়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত তাদের লালন-পালন করা।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :
যার তিনজন মেয়ে বা তিনজন বোন রয়েছে অথবা দুজন মেয়ে বা দুজন বোন রয়েছে আর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করল, তার জন্যে রয়েছে জান্নাত।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা, তালীম- তরবিয়তের ব্যাপারেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি সপ্তাহে একদিন নির্ধারণ করে রেখেছিলেন শুধু তাদের জন্য। তিনি সে দিন তাদের কাছে আসতেন, তাদের আল্লাহর বাণী ও তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ শিক্ষা দিতেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের ঘরের চার দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ করেও রাখেননি, যেমনটি সাধারণত ধারণা করা হয়। বরং তিনি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাইরে বের হওয়ার বৈধতা ঘোষণা করেছেন। যেমন মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ, অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। এমনকি লজ্জা-শালীনতা বজায় রেখে ইসলামী পর্দার অনুকূলে থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মুআমালাকেও নারীর জন্য জায়েয করেছেন। তাদের জন্য মসজিদে গমনাগমন বৈধ রেখেছেন, তারা মসজিদে যেতে চাইলে বারণ করতে নিষেধ করেছেন।
তিনি বলেন,

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسَاجِدَ" [رواه أحمد وأبوداود]

তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদ হতে বারণ করো না।
নারীদের ব্যাপারে তিনি আরো বলেছেন:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" [متَّفقٌ عليْهِ]

তোমরা নারীদের ক্ষেত্রে কল্যাণকামী হও।
এ হাদীসের দাবি হচ্ছে, নারীদের সাথে বন্ধুপ্রতিম আচরণ নিশ্চিত করা, তাদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, তাদের মন-মানসিকতা ও চাওয়া-পাওয়ার মূল্য দেয়া এবং তাদের কোন রূপ কষ্ট না দেয়া।

পনেরতম আসর: নবী ও নারী (২)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীদেরকে স্ত্রীদের জন্য খরচ করতে উৎসাহ দিয়েছেন।
তিনি বলেন,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ" [متفقٌ عليْهِ]

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে কোনো ব্যয় করবে, তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। এমনকি খাবারের যে লোকমাটি স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেবে তার সওয়াবও তুমি পাবে।

অধিকন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের জন্য ব্যয় করাকে সর্বোত্তম ব্যয় বলে চিহ্নিত করেছেন।
তিনি বলেন,

أَفْضَلُ دِينَارٍ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ" [رواه مسلم]

সর্বোত্তম অর্থ তা-ই, যা ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য খরচ করে।
তিনি আরো বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْـمَاءِ أُجِرَ" [رواه أحمدُ وحسَّنه الألبانيُّ]

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পানি পান করালেও সে সওয়াব প্রাপ্ত হবে।
এ হাদীস শুনে ইরবাজ বিন সারিয়া রা. সাথে সাথে তার স্ত্রীকে পানি পান করান এবং তাকে রাসূলের এ হাদীস শোনান।
এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাদের নারীর প্রতি সদাচার, নম্রতাপূর্ণ আচরণ, তাদের প্রতি স্নেহশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। আরো শিক্ষা দিয়েছেন ভালো জিনিসগুলো তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া ও সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করার।
তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, একজন পুরুষ ভাল মানুষ ও সৎ চরিত্রবান হিসাবে বিবেচিত হবার বড় প্রমাণ হলো নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার।

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ [رواه أحمد والترمذي]

তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম।
তিনি স্বামীদেরকে নিজ স্ত্রীদের ঘৃণা ও তাদের প্রতি রাগান্বিত হতে নিষেধ করেছেন।
তিনি বলেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً – أَي لا يبغَضُها – إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ" [رَوَاهُ مُسْلم]

কোন মুমিন পুরুষ মুমিন নারীকে দূর করে দেবে না- তাকে ঘৃণা করবে না- তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, আরেকটি পছন্দ হবে।
এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে বিরাজিত ইতিবাচক ও ভালো স্বভাবগুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে এবং নেতিবাচক দিকগুলোকে গুরুত্ব না দিতে। কারণ, নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিলে তা নারী-পুরুষের মাঝে বৈরিতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর দাঁড় করাবে। ভেঙে যাবে সুন্দর সংসার।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের প্রহার করতেও নিষেধ করেছেন।
তিনি বলেন,

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ" [رَوَاهُ أَبُو دَاود]

তোমরা আল্লাহর বাঁদিদের প্রহার কর না।
যারা নারীদের কষ্ট দেয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি দুর্বল জাতির অধিকারগুলোকে খুব জটিল মনে করি : নারী ও ইয়াতীম। অর্থাৎ যারা এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রতি দুর্ব্যবহার ও জুলুম করবে, আল্লাহর দরবারে তারা ছাড় পাবে না। বরং দুনিয়া- আখেরাত উভয় জগতেই তারা শাস্তি ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন হবে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষ উভয়কে পরস্পরের গোপন খবর বাইরে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত

হবে ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে শয্যা গ্রহণ করল, এবং যে স্ত্রী স্বামীর সাথে শয্যা গ্রহণ করল, অতঃপর গোপন বিষয়াদি বাইরে প্রকাশ করে দিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সম্মান করতেন এর আরেকটি প্রমাণ হল, তিনি স্ত্রীদের ব্যাপারে স্বামীদেরকে খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। এবং তাদের ভুল-ত্রুটি অন্বেষণ করতে বারণ করেছেন। জাবের রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের খেয়ানতকারী জ্ঞান করে কিংবা তাদের বিচ্যুতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে পুরুষদেরকে রাতের বেলায় আকস্মাৎ ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। নারীদের সাথে রাসূলের ব্যবহার ছিল আরো অমায়িক, আরো বন্ধুত্বপূর্ণ। তাদের ক্ষেত্রে নম্রতা ও স্নেহশীলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি।

আসওয়াদ রা. বলেন, আমি আয়েশা রা. -কে জিজ্ঞাসা করেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বাড়িতে কোন কাজ করতেন? তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করতেন। সালাতের সময় হয়ে গেলে সালাতের জন্য উঠে পড়তেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদেরকে মিষ্টি কথা আর কৌতুকের মাধ্যমে প্রফুল্ল রাখতেন। তিনি একদিন আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি সব বুঝতে পারি। আয়েশা বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনি কীভাবে তা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, তুমি যখন সন্তুষ্ট থাক তখন বল, হ্যা, এমনই, মুহাম্মদের রবের শপথ। আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, ইবরাহিমের রবের শপথ। আয়েশা বললেন, আল্লাহর রাসূল আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে, আমি শুধু আপনার নামটিই বাদ দেই। আমার অন্তরে আপনি ঠিকই বিদ্যমান থাকেন, এতে কোনো পরিবর্তন আসে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী খাদিজাকে কখনো ভোলেননি, এমনকি মৃত্যুর পরও না। আনাস রা. বলেন, রাসূলের নিকট কোনো উপহার সামগ্রী আসলে তিনি বলতেন। এগুলো অমুকের কাছে নিয়ে যাও, সে খাদিজার বান্ধবী ছিল। এ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নারীর প্রতি ভালোবাসা ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কিছু নিদর্শন।

হে নারী স্বাধীনতার দাবিদার ব্যক্তিবর্গ, তোমাদের মাঝে এর কোন কোনটি বিদ্যমান আছে! একটু ভেবে দেখবে কি?

ষোলতম আসর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি এবং স্ব গোত্রকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়ত প্রাপ্ত হন। এটা মানুষের জ্ঞানে-অভিজ্ঞতায় পূর্ণতা প্রাপ্তির বয়স। রমযান মাসের সতের তারিখ সোমবার দিন তিনি যখন হেরা গুহায় তখন ফেরেশতা তার নিকট অবতীর্ণ হন। (যখন ওহী নাযিল হত তার কাছে খুব কঠিন লাগত। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত, ঘর্মাক্ত হয়ে যেত কপাল।)

যখন ফেরেশতা এসে বললেন, আপনি পড়ুন, তিনি বললেন, আমি পড়তে পারি না। ফেরেশতা তাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন - তাতে তার খুব কষ্ট হল-। ফেরেশতা আবার বললেন, পড়ুন, তিনি বললেন, আমি পড়তে পারি না। এভাবে তিনবার হল। অতঃপর ফেরেশতা বললেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿العلق٥-١﴾

পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড় আর তোমার রব মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন- তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক: ১-৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে খাদিজার নিকট ফিরে এলেন। যা দেখলেন তাকে জানালেন। খাদিজা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : এটা আপনার জন্য শুভ সংবাদ। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখেন। সত্য কথা বলেন। বিধবাদের অন্নের ব্যবস্থা করেন। অসহায়দের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করেন। মেহমানদারী করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য করেন।

অতঃপর খাদিজা রাসূলকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেল এর নিকট গেলেন - তিনি ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিব্রু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং তা লিখতে পারতেন। ইঞ্জিলের বিশেষ কিছু অংশ তিনি আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ হয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন- খাদিজা তাকে বললেন : ভাই, আপনার এ ভাইয়ের ছেলের ঘটনাটি শোনেন। ওরাকা তাকে বললেন, ভাতিজা! কি দেখছ তুমি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাটি বিস্তারিত বললেন। ওরাকা শুনে বললেন : এ তো সে নামুস যা আল্লাহ তাআলা নবী মুসা আ. এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। আফসোস! আমি যদি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যখন আপনার জাতি আপনাকে দেশ হতে বের করে দেবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কি আমাকে দেশ হতে বের করে দেবে? তিনি বললেন : হ্যা, আপনার মতো দায়িত্ব নিয়ে যে কেউই এসেছে, তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আপনার সেদিনটি আমার জীবদ্দশায় আসে, আমি আপনাকে সাহায্য করব। এরপর ওরাকা আর বেশি দিন বাঁচেননি।

এরপর বেশ কিছু দিন ওহী বন্ধ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দিন অপেক্ষা করেছেন, কোন কিছুই দেখতে পাননি। এ জন্য রাসূল খুব চিন্তিত হলেন। অধীর আগ্রহে ওহীর প্রতীক্ষায় রইলেন।

এরপর একদিন আসমান-জমিনের মাঝখানে একটি চেয়ারের উপর ফেরেশতা দৃশ্যমান হলেন। তাকে সান্ত্বনা দিলেন ও শুভ সংবাদ শোনালেন - আপনি সত্যিকারার্থেই আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে ভয় পেলেন। খাদিজার কাছে আবার গেলেন এবং বললেন, আমাকে কম্বলাবৃত কর, আমাকে কম্বলাবৃত কর। এ সময় আল্লাহ তার উপর নাযিল করলেন :

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿المدثر৪-١﴾

হে কম্বল আচ্ছাদিত! ওঠ, সতর্ক কর। এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। তোমার কাপড় পবিত্র কর।

এ আয়াতগুলোর ভেতর আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় জাতিকে সতর্ককরণ, আল্লাহর প্রতি আহ্বান এবং তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্বয়ং রাসূলকেও সকলপ্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার হতে নিজকে পবিত্র করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেলেন - পূর্ণ ইয়াকীনের সাথে জেনে নিলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর আনুগত্য পূর্ণভাবে আদায়ে সচেষ্ট হলেন। ছোট-বড়, আযাদ-গোলাম, পুরুষ-মহিলা, সাদা-কালো সকলকেই তিনি আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলেন। আল্লাহর তাওফীকে প্রত্যেক গোত্র হতেই কতক লোক -যাদের ভাগ্যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী

রেখেছিলেন- রাসূলের ডাকে সাড়া দিলেন। ইসলামের আলোয় আলোকিত হলেন। মক্কার কতিপয় জাহেল লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে কেন্দ্র করে কষ্ট-নির্যাতন আরম্ভ করল। চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেফাযত করলেন। তিনি ছিলেন ভদ্র, অনুকরণীয় ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তার বর্তমানে রাসূলের ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। কারণ, তারা জানত মুহাম্মদ তার নিকট খুবই প্রিয়। আবার সে তাদের ধর্মের একজনও বটে। এ জন্যই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেনিম তার সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতাও পোষণ করেনি।
ইবনে জাওযি রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বছর যাবত গোপনে গোপনে দাওয়াত কার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী নাযিল হল :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿الحجر٩٤﴾

যে ব্যাপারে তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা দৃঢ়তার সাথে পালন কর,এবং মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চল।
এর পর যখন আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী নাযিল হল :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿الشعراء٢١٤﴾

তোমার নিকটজনদের ভীতি প্রদর্শন কর।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করেন। অতঃপর উচ্চস্বরে ইয়া সাবাহাহ! বলে আওয়াজ দিলেন। তারা সকলে বলাবলি করল : কে ডাকছে? তাদের পক্ষ হতেই উত্তর আসল : মুহাম্মদ! সকলে তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। তিনি বললেন, হে অমুকের বংশধরগণ, হে আবদে মানাফের বংশধরগণ, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, অতঃপর সকলেই তাঁর নিকট জমায়েত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের বলি, এ পাহাড়ের পাদদেশে শত্রু পক্ষের একটি বড় ঘোড়ার বহর অপেক্ষা করছে, তবে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে জানবে? তারা সমস্বরে বলল : আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তি হতে সতর্ক করছি। এ কথা শোনা মাত্রই চাচা আবু লাহাব বলে উঠল : ধ্বংস হোক তোমার! এজন্যই কি তুমি আমাদের জমায়েত করেছ? এ বলে সে উঠে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন :

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴿٥﴾

ধ্বংস হয়ে গেছে আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হয়ে গেছে সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসেনি। অচিরেই সে লেলিহান শিখাময় জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে, এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন কারী, তার গলদেশে শক্ত পাকানো রশি রয়েছে।

সপ্তদশ আসর:নিপীড়ন-নির্যাতনের বিপরীতে রাসূলের ধৈর্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতের জটিল ও কঠিন ময়দানে প্রবেশ করেছেন। উপদেশ প্রদানের সকল পথে গমন করেছেন। দিক নির্দেশনার সমস্ত প্রান্তরে পা রেখেছেন। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এক আল্লাহর প্রতি, পূর্ব পুরুষদের অনুসৃত সকল উপাস্যদের উপাসনা পরিত্যাগ করার প্রতি, আরো আহ্বান জানিয়েছেন শিরক, কুফর, মূর্তি পূজা ও মূর্তিপূজকদের

ত্যাগ করার প্রতি। অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ কর্ম হতে বারণ করেছেন। কিন্তু খুব কম মানুষই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, বেশির ভাগ লোকেই প্রত্যাখ্যান করেছে।
আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তা ও চাচা আবু তালেবের তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও রাসূলকে কষ্ট দেয়া হয়েছে অনেক। অবরুদ্ধ করা হয়েছে। সংকুচিত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তার জীবন। নবুওয়তের সপ্তম বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালেব, বনু হাশেম ও আবদুল মুত্তালিব বংশীয় মুসলমান ও কাফির সকল ব্যক্তি, শিয়াবে আবু তালেবে প্রবেশ করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আবু লাহাব। এদিকে কাফিররা তাদের সাথে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিল। তাদেরকে সর্বতভাবে বয়কট করল। কখনো সন্ধি চুক্তিতে আসবে না বলে ঘোষণা দিল। বাজারের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হল। খাদ্য-সামগ্রী পৌঁছানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। যতক্ষণ না তারা রাসূলকে হত্যার জন্য তাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এ সব জুলুম অন্যায়ের অঙ্গীকার নামা লিপিবদ্ধ করে কাবা ঘরের দেয়ালে তারা ঝুলিয়ে দিল। এদিকে কাফিরদের নির্যাতনের তীব্রতা লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথিদের ইথিওপিয়ায় (হাবশা) হিজরতের নির্দেশ দিলেন। এটা ছিল দ্বিতীয় হিজরত। এ যাত্রায় ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা রওয়ানা করলেন। তাদের সাথে রওনা করলেন ইয়েমেনের মুসলমানগণও।
কষ্ট-নির্যাতন এবং ক্ষুধা ক্লিষ্ট হয়ে দীর্ঘ তিন বছর শিয়াবে অতিবাহিত করলেন তিনি ও তাঁর সাথিরা। কোন কিছুই তাদের নিকট পৌঁছত না, যৎসামান্য যাও যেত, অত্যন্ত গোপনে। এক পর্যায়ে তাদের বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত চিবাতে হয়েছে। নবুওয়তের দশম বর্ষ পর্যন্ত মুসলমানগণ এ দুর্বিষহ জীবন যাপন করেন। এক সময় কুরাইশের কতক লোক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ঘোষণা দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথিদের নিয়ে বন্দিদশা থেকে বের হয়ে আসলেন।
এ বছরই ইন্তেকাল করলেন স্ত্রী খাদিজা রা.। এর প্রায় দুই মাস পর মারা গেলেন চাচা আবু তালেব। তিনি মারা যাওয়ার পর রাসূলের উপর কুরাইশদের নির্যাতন, বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি বেড়ে গেল। যা আবু তালেবের জীবিত অবস্থায় তারা করতে পারেনি।
সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক ঘটনায় এসেছে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরের সামনে সালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহেল তার সাথিদের নিয়ে পাশেই বসা ছিল। কিছু দূরেই গতকালের জবাই করা একটি উটের পচা ভুঁড়ি পড়ে ছিল। আবু জাহেল বলল, তোমাদের মধ্যে কে পারবে, অমুকদের জবাই করা উটের ভুঁড়িটি এনে মুহাম্মদ যখন সেজদায় যাবে তার পিঠের উপর রেখে দিতে? তাদের মধ্যে এক হতভাগা উঠে গিয়ে তা নিয়ে আসল এবং রাসূল সেজদায় যাওয়ার পর তার কাঁধের উপর রেখে দিল। এ দৃশ্য দেখে তারা খিলখিল করে হাসতে লাগল। একে অপরের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। মেয়ে ফাতেমা দৌড়ে আসলেন, এবং পিতার কাঁধ হতে ভুঁড়ি সরিয়ে তাদের গাল-মন্দ করতে লাগলেন। সালাত শেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে তাদের জন্য বদ-দোয়া করলেন। তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের বিচার কর। দোয়ার আওয়াজ শোনার সাথে সাথে তাদের হাসি উবে গেল। তার বদ-দুআকে তারা ভয় করতে লাগল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :
হে আল্লাহ! তুমি আবু জাহেল, উত্বা, শাইবা, ওলীদ, উমাইয়া ও উকবার বিচার কর।
ইবনে মাসউদ রা. বলেন : যে আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তার শপথ করে বলছি, যাদের নাম ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ-দুআ করেছিলেন আমি তাদের সকলকেই বদর যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি। অতঃপর তাদের সকলকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীর এক জায়গায় এসেছে, একদিন উকবা বিন আবি মুআইত রাসূলুল্লাহর কাঁধ ধরে গ্রীবায় কাপড় পেঁচাল এবং নিশ্বাস বন্ধ করে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ডভাবে চাপ দিল। ইত্যবসরে আবু বকর রা. দৌড়ে এলেন এবং তাকে মুক্ত করে বললেন, তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও এ অপরাধে যে তিনি বলেন আমার রব আল্লাহ ?

কাফিরদের নির্যাতন যখন দিন দিন বেড়েই চলল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সেখানকার ছাকীফ গোত্রগুলোকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে শত্রুতা, উপহাস ও কষ্ট ছাড়া কিছুই পেলেন না। তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে পায়ের উভয় টাখনু রক্তাক্ত করে দিল। তিনি পুনরায় মক্কায় ফিরে আসতে মনস্থির করলেন। কারনুস সাআলিব নামক স্থানে এসে রাসূল উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন একটি মেঘমালা ছায়া করে আছে। ভালো করে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, জিবরাঈল সেখানে উপস্থিত। তিনি উচ্চ আওয়াজে বললেন : আপনার গোত্রীয় লোকজন কি করেছে এবং তারা কি উত্তর দিয়েছে, মহান আল্লাহ সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ শোনার জন্য তিনি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছেন। পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা তাকে ডাক দিয়ে সালাম করলেন। অতঃপর বললেন : মুহাম্মদ! আপনার গোত্র আপনাকে কি বলেছে, আল্লাহ শুনেছেন। আমি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। আপনার রব আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছে হয়, নির্দেশ করুন। আপনার মর্জি হলে আমি মক্কার দুটি পাহাড় এক সাথে মিশিয়ে দেই । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

বরং আমি আশা করছি, তাদের বংশ হতে এমন লোক বের হয়ে আসবে, যারা আল্লাহর ইবাদত করবে। তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।

আঠারতম আসর: আল্লাহর হেফাযতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

হে রাসূল! আপনার রব আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, আপনি তা পৌঁছে দিন। যদি তা না করেন, তবে আপনি আল্লাহর রেসালাত-ই আদায় করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষ হতে হেফাজত করবেন।

ইবনে কাছীর রহ. বলেন, অর্থাৎ আপনি আমার রেসালত পৌঁছাতে থাকুন, আমি আপনাকে হেফাজত করব, এবং আপনার শত্রুদের মুকাবিলায় আপনাকে শক্তিশালী করব। আমি আপনাকে তাদের উপর জয়ী করব, আপনি ভয় করবেন না, চিন্তাও করবেন না। কু-বাসনা নিয়ে আপনার পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারবে না। এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন এর একটি উদাহরণ : আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা: আবু জাহেল একদিন বলল, তোমাদের সামনে কি মুহাম্মদ মাটিতে কপাল ধূলায়িত করে? উত্তরে বলা হল, হ্যাঁ। সে বলল : লাত, উজ্জার শপথ! আমি যদি এমনটি করতে দেখি, তার গরদান পা দিয়ে মাড়িয়ে দেব-কর্দমাক্ত করে দেব তার চেহারা। এরপর

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন। সে কাছে । ইচ্ছা রাসূলুল্লাহর গরদান মাড়িয়ে দেওয়া। উপস্থিত সকলে উৎসাহ দিল। সে রাসূলের নিকট পৌঁছতে না পৌঁছতেই পিছু হটতে লাগল। আর দুই হাত দিয়ে নিজেকে হেফাযত করার চেষ্টা করতে দেখা গেল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল : কি হয়েছে? সে বলল, আমার ও তার মাঝখানে আগুনের গর্ত দেখতে পাচ্ছি, ভয়াবহ অবস্থা ও বিরাট সৈন্যবাহিনী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি সে আমার দিকে এগিয়ে আসত, ফেরেশতারা একটি একটি করে তার অঙ্গসমূহ ছেঁড়ে নিয়ে যেত।

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, আবু জাহেল বলেছে, আমি যদি মুহাম্মদকে কাবার পাশে সালাত আদায় করতে দেখি, তার ঘাড় মাড়িয়ে দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, যদি সে এমনটি করতে আসে, ফেরেশতারা তাকে পাকড়াও করবে। বুখারী ।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাসফা নামক গোত্রের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সুযোগ বুঝে তাদের এক যোদ্ধা, গাউরাস বিন হারেস রাসূলের একেবারে নিকটে চলে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে বলে, তোমাকে আমার কবজা থেকে কে রক্ষা করবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ । এ কথা শুনে তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ার উঠিয়ে বললেন, এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? সে বলল, উদারতার পরিচয় দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। সে বলল, না। এ সাক্ষ্য আমি দিতে পারব না। তবে, আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি। আপনার বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করব না এবং তাদের সাথেও থাকব না যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দিলেন। ফিরে গিয়ে সে বলল, আমি সর্বোত্তম মানুষের নিকট হতে এসেছি।

আনাস রা. বলেন, জনৈক খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করল। সে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পড়তে পারত। পরবর্তীতে সে রাসূলের কাতেব হিসেবে কাজ করত। কিছুদিন পর আবার খ্রিস্টান হয়ে গেল। এবং মানুষের কাছে বলে বেড়াতে লাগল, আমি যা লিখে দিয়েছি এর বেশি মুহাম্মদ কিছুই জানে না। তার মৃত্যু হলে লোকজন দাফন করে আসে, কিন্তু সকাল বেলা দেখতে পায় মাটি তাকে উপরে নিক্ষেপ করে রেখেছে। তারা বলাবলি করতে লাগল : এটা মুহাম্মদ এবং তার সাহাবীদের কাজ। আমরা চলে যাবার পর তারা তাকে মাটি খুঁড়ে বের করে উপরে নিক্ষেপ করেছে। দ্বিতীয় দিন খুব গভীর করে মাটিতে পুতে রেখে আসল, দ্বিতীয় দিনও মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে। তখনও তারা আগের মতো কথা বলল। তৃতীয় দিন আরো গভীর করে দাফন করল, তৃতীয় দিনও মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করল, তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে এটা মানুষের কাজ নয়। অতঃপর এভাবেই তাকে ফেলে দিল।

আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করার আরেকটি উদাহরণ :

কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার চক্রান্ত করল। তারা একমত হল যে, সব গোত্র হতে একজন করে শক্তিশালী যুবক একত্রিত করে তাদের হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার দেয়া হবে। তারা সকলে একযোগে মুহাম্মদের উপর হামলা করে হত্যা করবে। ফলে সব গোত্রই সমানভাবে দোষী সাব্যস্ত হবে। আর এভাবে আবদু মানাফের বংশধররা সকল আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সাহস করবে না। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করেন এবং

কাফিরদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন। সে রাতে তাঁকে নিজ বিছানায় ঘুমাতে বারণ করেন। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ আপনাকে হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
আরো একটি উদাহরণ : হিজরতের পথে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুরাকা ইবনে মালেক হতে হেফাজত করেছেন।
আরেকটি উদাহরণ : সাউর গুহায় কাফিরদের থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করা। আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর! যে দুইজনের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ, তাদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?
ইবনে কাছীর রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর হেফাজত করার আরো একটি উদাহরণ :
এত শত্রুতা, দুশমনি এবং রাতদিন ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারী, জালেম ও অত্যাচারী মক্কাবাসী হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করেছেন। এর জন্য আল্লাহ তাআলা সময়ে সময়ে বিভিন্ন মাধ্যম ও সাহায্যকারী তৈরি করে দিয়েছেন। যেমন নবুওয়তের শুরুতে চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করা হয়েছে। আবু তালেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব ভালোবাসতেন -মনের টানে, ধর্মের টানে নয়- তার মহব্বতের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। কারণ, আবু তালেব ছিলেন কুরাইশদের সকলের নিকট সম্মানিত ও অনুকরণীয় ব্যক্তি, আবার তাদের ধর্মের লোক - কাফির। এ মিলের জন্য আবু তালেবকে তারা সমীহ ও সম্মান করত। অন্যথায় তিনি মুসলমান হলে তার উপরও তারা চড়াও হত।
আবু তালেবের মৃত্যুর পর মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহকে অল্প হলেও কষ্ট দিতে পেরেছে। এরই মাঝে আল্লাহ তাআলা আনসারদের অন্তরে তার মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। তারা তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। এবং তাকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার শপথ করেন। মদীনায় আল্লাহ তাআলা কালো-সাদা সকল প্রকার শত্রু হতে তাঁকে হেফাজত করেন। যখনই মুশরিক কিংবা আহলে কিতাবের কেউ রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, আল্লাহ সে ষড়যন্ত্র উল্টো তাদের জন্য কাল বানিয়ে দিয়েছেন।

উনিশতম আসর: রাসূলের মহব্বত

রাসূলের মহব্বত ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে মুসলমান তার মাধ্যমে হেদায়েতের আলো ও ঈমানের সন্ধান পেয়েছে, কুফর থেকে বের হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, সে মুসলমান কিভাবে তাকে মহব্বত না করে পারে?
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষে হতে অধিক প্রিয় হব।
বরং রাসূলের মহব্বত তো নিজ সত্তার মহব্বতকেও অতিক্রম করে যেতে হবে। একদিন ওমর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমার নিকট, আমি ব্যতীত, সব থেকে বেশি প্রিয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, ওমর, আমার প্রাণের মালিক আল্লাহর শপথ, আমার প্রতি তোমার মহব্বত তোমার নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি হতে হবে। ওমর বললেন : হ্যাঁ, এখন আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও

বেশি প্রিয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন হয়েছে, ওমর। অর্থাৎ এখন তুমি বুঝতে পেরেছ, অতঃপর যা ওয়াজিব তাই উচ্চারণ করেছ।

সকলেই রাসূলের মহব্বতের দাবি করে। বেদআতি, প্রবৃত্তি পূজারি, কবর পূজারি, জাদুকর, ভেলকিবাজ ও জ্যোতিষীরা পর্যন্ত রাসূলের মহব্বতের দাবি করে। গুনাহ্গার ও ফাসেক ব্যক্তিরাও রাসূলের মহব্বতের দাবিদার। তবে, শুধু দাবিতেই সব কিছু হয় না, প্রমাণ দিতে হয়। রাসূলের মহব্বতের প্রমাণ হল. তার নির্দেশিত পথে চলা, নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা। এবং শুধু তার দেখানো পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসারে আল্লাহর ইবাদত করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল অস্বীকারকারী ব্যতীত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। আর যে অবাধ্য হল, সে অস্বীকার করল।

ঈদে মিলাদুন্নবী, তাজিয়া, মর্সিয়া, তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা ও এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলেই রাসূলের মহব্বত প্রকাশ পায় না। বরং তার মহব্বত প্রকাশ পায় সুন্নতের উপর আমল, তার আনীত শরীয়তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, তার আদর্শ জীবিতকরণ, তার উপর ও তার সুন্নতের উপর উত্থাপিত অপবাদ প্রতিহত করণ, তাঁর দেয়া সংবাদকে সত্য জ্ঞানকরণ, তাঁর ব্যাপারে কথা বলার সময় অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা, তাঁর নাম শোনার সাথে সাথে দরূদ পড়া, তাঁর শরীয়তে নতুন কোন বিষয়ের প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করা অর্থাৎ যাবতীয় বেদআত প্রত্যাখ্যান করা, তাঁর সাহাবীদের মহব্বত করা ও তাদের পক্ষ নেয়া, তাদের ফযীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া, তার সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণকারী, তার শরীয়তের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এবং যারা তাঁর দীনকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, তাদের অবমাননাকারীকে ঘৃণা করা। এসব কিছুই রাসূলের মহব্বতের অন্তর্ভুক্ত। যে এর বিরোধিতা করবে বিরোধিতা অনুপাতে দীন থেকে দূরে সরে যাবে।

উদাহরণত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার এ দীনে ভিন্ন কিছুর আবিষ্কার করবে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে।

তিনি আরো বলেছেন, সাবধান! তোমরা দীনে নতুন আবিষ্কৃত বিষয় হতে দূরে থাক। কারণ, প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বস্তুই বেদআত।

বেদআতের ব্যাপারে এতো কঠোর বাণী সত্ত্বেও অনেকেই আছে, যারা আল্লাহর দীনে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করে- যা ধর্ম বলে স্বীকৃত নয়- বরং এসবকে তারা খুব ভাল ও উপকারী মনে করে এবং রাসূলের মহব্বতের বস্তু হিসেবে জ্ঞান করে। অনেক সময় রাসূলের উপর মিথ্যা হাদীস তৈরি করে রাসূলের নামের সাথে যুক্ত করে দেয়। আর বলে, আমরা রাসূলের স্বার্থে মিথ্যা বলেছি, তাঁর বিরুদ্ধে নয়। এটা তাদের সব চেয়ে বড় গোমরাহী, বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা। কারণ, আল্লাহর দীন পরিপূর্ণ, তাদের মনগড়া মিথ্যাচারের মুখাপেক্ষী নয়।

রাসূলের মহব্বতের আরো একটি আলামত হল: তার সাহাবাদের গালমন্দ না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ সদকা করলেও, তাদের খরচকৃত এক অঞ্জলি কিংবা তার অর্ধেকেরও সমান হবে না।

তা সত্ত্বেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা রাসূলের সাহাবাদের গালমন্দ করে। আবু বকর, ওমরকে অভিসম্পাত করে। পবিত্র কুরআনে আয়েশা রা. কে সতী-সাধ্বী ও নিষ্কলুষ ঘোষণা করার পরও তারা অপবাদ দেয়। আর এসব ক্ষেত্রেও তাদের হাস্যকর দাবি, আমরা রাসূলের মহব্বত এবং আহলে বাইতের মহব্বতের কারণেই এমনটি করি।

রাসূলের মহব্বতের আরেকটি আলামত : তাঁর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসায় সীমা ছাড়িয়ে যেয়ো না, যেমন খ্রিস্টান

সম্প্রদায় মারিয়াম পুত্র ঈসার ব্যাপারে করেছে। আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে তাঁর রাসূল এবং বান্দাই বল।

এতদসত্ত্বেও এমন অনেক লোকের আগমন ঘটেছে, যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এমন গুণে গুণান্বিত করে, যা কেবল আল্লাহর সাথেই সামঞ্জস্যশীল।

উদাহরণস্বরূপ: রাসূলের নিকট রিযিক চায়, তাঁর নিকট অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা কামনা করে, আপদ-বিপদ ও ধ্বংস হতে মুক্তি চায়, আরো এমন কিছু প্রার্থনা করে, যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করা যায় না। এরপরও তাদের ধারণা এগুলো রাসূলের মহব্বতের প্রমাণ। বাস্তবতা হচ্ছে, এগুলো মূর্খতা, শিরক ও রাসূলের বিরোধিতার আলামত।

বিশতম আসর: নুবওয়তের বড় বড় আলামত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, আল কুরআনুল কারিম। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত সকল আরব, অনারবদের সাথে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন যে, কারো সাধ্য থাকলে এর মত দ্বিতীয় আরেকটি পেশ করে দেখাও।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

আমি আমার বান্দার উপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তোমরা যদি এর ব্যাপারে সন্দিহান হও, তাহলে এর মতো একটি সূরা বানিয়ে পেশ করে দেখাও। এবং এর জন্য আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সহযোগীদের একত্রিত করে চেষ্টা কর, যদি তোমরা নিজেদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

তারা কি এরূপ বলে যে, এটা সে নিজে তৈরি করে নিয়েছে? তুমি বলে দাও, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা এনে দেখাও। এবং আল্লাহ ব্যতীত যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা স্বীয় দাবিতে সত্যবাদী হও।

ইবনে জাওযি রহ. বলেন, আল কুরআনুল করিম বহু কারণে অলৌকিক ও অসাধারণ। যেমন,

এক. সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিত বর্ণনা উভয় ক্ষেত্রেই ফাসাহাত-বালাগাতের (সাহিত্য ও অলংকরণ) সুন্দরতম ব্যঞ্জনা ও মনোজ্ঞতা। একই ঘটনা একবার বিস্তারিত, অন্যবার সংক্ষেপে বর্ণনার পরও উভয়ের ভাব ও উদ্দেশ্যে-অর্থ প্রকাশে কোনো ব্যত্যয় ঘটে না।

দুই. আল কুরআন পদ্যও নয়, গদ্যও নয়, বরং এতে অনুসৃত হয়েছে সম্পূর্ণ এক ভিন্নতর পদ্ধতি। আর এ দুটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই পুরো আরব জাতির সাথে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তারা অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, অপারগতা প্রকাশ করেছে এবং কুরআনের অলৌকিকতার স্বীকৃতিও দিয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগিরা বলেছে, আল্লাহর শপথ! কুরআনের রয়েছে নিশ্চিত স্বাদ, এবং এর রয়েছে নিশ্চিত লাবণ্য।

তিন. পূর্বেকার উম্মতদের সংবাদ এবং নবীদের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। যা আহলে কিতাবগণ জানত। অথচ যিনি এ কুরআন নিয়ে এসেছেন তিনি নিরক্ষর। লেখতেও জানতেন না, পড়তেও পারতেন না। জ্যোতির্বিদ্যাও তার জানা ছিল না।
আরবদের মধ্যে যারা পড়া লেখা জানত, শিক্ষিত লোকদের সাথে বসত, আল কুরআনের এ শিক্ষা তাদেরও আয়ত্বের বাইরে ছিল।
চার. অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান, যা হুবহু সেভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর এটিই তার সত্যতাকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। উদাহরণত: ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ/. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا/.فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. وَلَنْ تَفْعَلُوا.

যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে মৃত্যু কামনা কর। এরপর বলা হয়েছে, তারা কক্ষনো মৃত্যু কামনা করবে না। আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমরা এর মতো একটি সূরা এনে দেখাও। এর পর বলা হয়েছে, তারা এটা করে দেখাতে পারবে না। আর বাস্তবেও তারা করে দেখাতে পারেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ.

তুমি কাফিরদের বলে দাও, তোমরা অবশ্যই পরাস্ত হবে। আর বাস্তবেও তারা পরাস্ত হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায়, তোমরা নিরাপদে মসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে।
আবু লাহাবের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অনতিবিলম্বে সে লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে, লাকড়ি বহনকারী তার স্ত্রীও। তার গলায় থাকবে পাকানো রশি। এর অর্থ তারা উভয়ে কাফির অবস্থায় মারা যাবে, আর সে অবস্থাতেই তারা মারা গিয়েছিল।
পাঁচ. আল কুরআন মতদ্বৈততা ও বৈপরীত্য হতে পবিত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তারা এতে অবশ্যই অনেক বৈপরীত্য থাকত। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এর সংরক্ষণ করব।
হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِي مِنَ الْآيَاتِ مَا آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ, وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ, فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ [متفقٌ علَيْه]

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে এমন অনেক নির্দেশন প্রদান করা হয়েছে যা দেখে মানুষ তাদের উপর ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন,ওহী,যা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। আমি আশাবাদী,তাদের সকলের চেয়ে আমার অনুসারী বেশি হবে।
ইবনে আকীল বলেছেন, আল- কুরআনের একটি মাত্র আয়াতের ব্যাপারেও এ পর্যন্ত কেউ এমন অভিযোগ আনতে পারেনি যে এটি অন্য কোনো গ্রন্থ হতে সংকলিত বা অন্য কারো রচিত। এটিও আল কুরআনের অলৌকিকত্বের একটি বিরাট প্রমাণ। কারণ, এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে তথ্য

নিয়ে লিখে থাকে। যেমন, মুতানাব্বির ব্যাপারে কথিত যে তিনি বুহতারী থেকে তথ্য নিয়ে রচনা করেছেন।
ইবনে জাওযী রহ. বলেন : আমি দুটি অপূর্ব অর্থ বের করেছি।
এক : অন্য সকল নবীদের মোজেজা, তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে যদি কোনো নাস্তিক এ প্রশ্ন করে বসে : মুহাম্মদ ও মুসা যে সত্য নবী তার প্রমাণ কি?
তাকে যদি এর উত্তরে বলা হয় : মুহাম্মদের নবুওয়তের প্রমাণ চাঁদ দুই টুকরা করা, আর মুসার নবুওয়তের প্রমাণ সমুদ্র চিরে পথের সৃষ্টি করা । সে বলবে : এটা অসম্ভব।
সুতরাং আল্লাহ তাআলা এ কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ তথা মোজেজা বানিয়েছেন যা চিরকাল বিদ্যমান থাকবে। এ কুরআন রাসূলের মৃত্যুর পরও তার সত্যতার ঘোষণা করবে। রাসূল হলেন, পূর্ববর্তী নবীদের সত্যায়নকারী ও তাদের নবুওয়তের দলিল। তিনি সকল নবীর নবুওয়ত স্বীকার করেছেন এবং তাদের সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সংবাদ দিয়েছেন তাদের ঘটনা পঞ্জিরও।
দুই : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রিস্টানদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের নিকট রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিচয় বিদ্যমান আছে। (ভুলবশত কাফিরদের সাথে গোপনে আঁতাতকারী বদরি সাহাবি) হাতেব ইবনে আবি বোলতাআর ঈমান ও আয়েশার পবিত্রতার সাক্ষ্য রয়েছে পবিত্র কুরআনে। এগুলো ছিল গায়েবী সংবাদ। যদি কুরআন ও ইঞ্জিলের ভেতর তাঁর গুনাগুণ বিদ্যমান না থাকত, তারা ঈমান থেকে ফিরে যেত। এ দিকে হাতেব ও আয়েশা যদি জানতেন যে, কুরআন তাদের ব্যাপারে যে সাক্ষ্য দিয়েছে, তা মিথ্যা ও অলীক তবে তারাও ঈমান ত্যাগ করতেন।

একুশতম আসর: রাসূলের ইবাদত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি ইবাদত করতেন। সালাত, সওম, যিকির, দুআ সব কিছুই বেশি বেশি করতেন। সব আমলই তিনি খুব সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করতেন। আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের সালাত যদি ব্যথা কিংবা অন্য কোনো কারণে ছুটে যেত, তাহলে দিনের বেলায় বার রাকাত সালাত আদায় করে নিতেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের সালাত কখনো ত্যাগ করতেন না। রাতে এতো দীর্ঘ কিয়াম করতেন যে, পা ফুলে যেত। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তর দিলেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাইব না?
হুযাইফাতুল ইয়ামান রা. বলেন, কোন একরাতে আমি রাসূলের সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারার তেলাওয়াত শুরু করলেন, আমার ধারণা ছিল একশত আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু না, (তা করেননি বরং) কেরাত চালিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, এক সূরা দিয়ে এক রাকাত শেষ করবেন। তিনি তাও করলেন না। সূরা বাকারা শেষ করে সূরা নিসা শুরু করলেন। এ সূরা শেষ করে সূরা আলে ইমরান আরম্ভ করলেন এবং এটিও শেষ করলেন। তিলাওয়াতের পুরোটাই ধীরে ধীরে তারতীলসহ আদায় করলেন। তিলাওয়াতে আল্লাহর তাসবীহ সম্বলিত আয়াত আসলে, তাসবীহ পড়েছেন। প্রার্থনার আয়াত আসলে, প্রার্থনা করেছেন। কোনো বস্তুর অনিষ্ট হতে পানাহ চাওয়ার আয়াত আসলে, অনিষ্ট হতে পানাহ চেয়েছেন। অতঃপর রুকু করলেন। রুকুতে পড়লেন, سبحان ربي العظيم রুকুও প্রায় কিয়ামের সমান দীর্ঘ হল। অতঃপর বললেন, سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد অতঃপর লম্বা কেয়াম করলেন, প্রায় রুকুর সমান।

এরপর সেজদা করলেন, সেজদায় বললেন, سبحان ربي الأعلى সেজদাও প্রায় কেয়ামের সমান দীর্ঘ হল।
নবীজী মুকীম অবস্থায় নিয়মিত খুব যত্ন সহকারে দশ রাকাত সালাত আদায় করতেন, যোহরের আগে দুই রাকাত, যোহরের পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, এশার পর ঘরে এসে দুই রাকাত এবং ফজর সালাতের আগে দুই রাকাত।
অন্য সব নফল সালাতের তুলনায় ফজর সালাতের সুন্নতের প্রতি তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন। সফর কিংবা মুকীম উভয় অবস্থায় ফজরের সুন্নত এবং বেতেরের সালাত ত্যাগ করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় এ দুই সুন্নত ব্যতীত অন্য কোনও সুন্নত পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।
যোহরের আগে কখনো কখনো চার রাকাত পড়তেন। একবার রাতের সালাতে শুধুমাত্র একটি আয়াতই বার বার পড়তে থাকলেন এরই মাঝে সকাল হয়ে গেল।
রোযা রাখার জন্য সোম ও বৃহস্পতিবারের অপেক্ষায় থাকতেন।
তিনি বলেছেন, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। আমার আমল রোযা অবস্থায় পেশ হোক, এটি আমার ভালো লাগে।
প্রতি মাসে নিয়মিত তিন দিন রোযা রাখতেন। মুআজা আদাবিয়া নামক জনৈক সাহাবী আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূল কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মাসের কোন অংশে রোযা রাখতেন? বললেন, এর জন্য কোনও ধরা বাধা নিয়ম ছিল না।
ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর কিংবা মুকীম অবস্থায় সাধারণত আইয়ামে বীয তথা মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা বিহীন থাকতেন না।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোযা রাখতেন এবং সাহাবাদের রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন।
আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মাসে শাবানের চেয়ে বেশি রোযা রাখতেন না। তিনি শাবান মাসের পুরোটাই রোযা রাখতেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, দিন কয়েক ছাড়া পূর্ণ শাবানই তিনি রোযা রাখতেন।
যিকিরের ইবাদত সম্পর্কে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিহ্বা আল্লাহর যিকির হতে কখনো ক্লান্ত হত না। সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহর যিকির করে যেতেন। সালাত শেষে তিনবার এস্তেগফার পড়তেন এরপর বলতেন :

اللّٰهُمَّ أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام .

সালাত শেষে আরো বলতেন :

لاإلٰه إلا الله وحده لاشريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللّٰهُمَّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

রুকু-সেজদায় বলতেন ,

سبوح قدوس، رب الملائكة والروح.

আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকাংশ দুআ ছিল,

اللّٰهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

তিনি এস্তেগফারও বেশি বেশি করতেন। ইবনে ওমর রা. বলেন, আমরা এক মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একশত বার পর্যন্ত এস্তেগফার পড়তে শুনতাম,

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم .

তিনি এবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন। বলতেন,

عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ, فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا

তোমাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ কিন্তু (তোমাদের সওয়াব লেখতে) ক্লান্ত হবেন না, তোমরাই বরং (আমল করতে করতে) ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ব্যক্তির নিয়মিত আমলকেই তিনি পছন্দ করতেন।

বাইশতম আসর: ইসলাম প্রসারের সূচনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে উপহাস, বিদ্রূপ আর অবজ্ঞার শিকার হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মুতইম ইবনে আদীর আশ্রয়ে মক্কায় অবস্থান করেন।

বয়কট, মিথ্যা ও কঠোরতায় ভরপুর পরিবেশে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লৌহকঠিন প্রত্যয়ে দৃঢ় করতে চাইলেন। তাই তাঁকে ইসরা ও মিরাজের মর্যাদায় ভূষিত করলেন। প্রত্যক্ষ করালেন বড় বড় নিদর্শন। অবগত করালেন স্বীয় ক্ষমতা ও কুদরতের বিশাল ব্যাপ্তি। যাতে তিনি কুফর ও কাফিরদের মুকাবিলায় আরো বেশি মনোবল অর্জনে সক্ষম হন।

ইসরা, রাত্রিতে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদুল আকসা পর্যন্ত সফর এবং সে রাতেই ফিরে আসা।

মিরাজ, ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণ, নবীদের সাথে সাক্ষাৎ, অদৃশ্য জগৎ প্রত্যক্ষকরণ ইত্যাদি। এ সফরেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়।

এই বিস্ময়কর ঘটনাটি মুসলমানদের ঈমান পরীক্ষার একটি উপলক্ষ্যে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে শোনার পর কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। আবার কতিপয় লোক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট গিয়ে বলে, আপনার সঙ্গী দাবি করছেন, আজ রাতে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করে আবার ফিরে এসেছেন। আবু বকর বললেন, তিনি কি এরূপ বলেছেন? তারা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই বলেছেন। আবু বকর বললেন, তিনি যদি এমন বলে থাকেন, তবে সত্যই বলেছেন। তারা বলল, আপনি কি বিশ্বাস করেন, তিনি এক রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়ে ভোর হওয়ার আগেই ফিরে এসেছেন?

আবু বকর বললেন, হ্যাঁ, আমি তো (তাঁর ব্যাপারে) এর চেয়েও দূরের বিষয়ে বিশ্বাস করি। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর দেয়া আসমানী সংবাদাদি বিশ্বাস করি।

আবু বকর রা. কে এজন্যই সিদ্দীক, তথা অধিক বিশ্বাসকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরাইশদের পক্ষ হতে বিরুদ্ধাচরণ ও দাওয়াত প্রচার কার্যক্রমে বাঁধা প্রদানের কারণে তিনি অন্যান্য গোত্রাভিমুখী হলেন। তায়েফ থেকে ফিরে এসে বিভিন্ন মেলাতে নিজেকে পেশ করতে শুরু করলেন এবং নিপুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে লোকদেরকে ইসলাম সম্বন্ধে বুঝাতে লাগলেন। ইসলাম ও আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর স্বার্থে তাদের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করেন।

কেউ কেউ খুব ঘৃণা ও নিষ্ঠুরভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ফিরিয়ে দিত। কেউ আবার সুন্দর ও শালীনভাবে না করে দিত। সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করেছে, বনু হানীফা গোত্র-মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার মুসাইলামার দল।

যাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে পেশ করেছেন, তাদের মধ্যে ইয়াসরিবের আউস বংশীয় একটি দলও ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে কথা বললেন, তারা তাঁকে চিনতে পারল। এবং বুঝে গেল যে, তিনিই সেই নবী, ইহুদীরা যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে থাকে। তারা নিজেদের মাঝে বলাবলি করল, আল্লাহর শপথ! এ নবীর আগমনের কথা-ই ইহুদীরা আমাদের বলে আসছে। আমরা তাদেরকে কোন মতেই আগে ঈমান গ্রহণ করার সুযোগ দেব না। তাদের ছয়জন তখনই ঈমান কবুল করল, আর এটি ছিল মদীনায় ইসলাম প্রচারের শুভ সূচনা। তাঁরা হলেন, ১. আসআদ বিন জুরারা ২. আউফ ইবনে হারেস ৩. রাফে বিন মালেক ৪. কুতবা বিন আমের বিন হাদীদা ৫. উকবা বিন আমের ৬. সাদ বিন রবি।
তাদের সকলেই পরবর্তী বছর পুনরায় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বদেশ ফিরে গেলেন।
পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুওয়তের দ্বাদশতম বছর প্রথম আকাবার বায়আত অনুষ্ঠিত হয়। এতে বারোজন মদীনাবাসী রাসূলের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। আউস বংশের দশজন আর খাযরাজ বংশের দুইজন। এদের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের ছয় জনের পাঁচজন বিদ্যমান ছিলেন। তারা সকলেই ঈমান গ্রহণ করলেন। শপথ করলেন, ঈমান ও সত্যবাদিতার জন্য উৎসর্গিত হবেন, শিরক ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করবেন, কল্যাণমূলক কাজ করবেন, এবং কখনো মিথ্যা বলবেন না। এরপর সকলেই মদীনায় ফিরে গেলেন। আর এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিলেন। একটি ঘরও এমন ছিল না যেখানে রাসূলের আলোচনা চর্চিত হয়নি।
প্রথম আকাবার পরের বছর, অর্থাৎ নবুওয়তের ত্রয়োদশতম বছর দ্বিতীয় আকাবার বায়আত অনুষ্ঠিত হয়। এ বায়আতে সত্তরজন পুরুষ ও দুই জন নারী অংশ নেন। এবং সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এই বলে বায়আত গ্রহণ করেন যে, উদ্যমতা ও আলস্য, উভয় অবস্থায় আনুগত্য করবেন, স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করবেন, সৎ কাজের আদেশ দেবেন, অসৎ কাজ হতে বিরত রাখবেন, আল্লাহর ব্যাপারে ধিক্কার, নিন্দা ও কোনো ভয়-ভীতির পরওয়া করবেন না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করবেন, তার বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোন অনিষ্ট প্রতিহত করবে।
অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিজদের মধ্য হতে আমির হওয়ার যোগ্য বারজন লোককে নির্বাচিত করে দিতে বললেন। এরা সকলেই রাসূলের শিক্ষা নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে প্রচার করবে। তারা খাযরাজ থেকে নয়জন এবং আউস থেকে তিনজন নকিব মনোনীত করে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা নিজ নিজ গোত্রের জিম্মাদার, যেমন জিম্মাদার ছিলেন ঈসা ইবনে মারইয়ামের হাওয়ারীবৃন্দ। আর আমি আমার বংশের জিম্মাদার। তারা সকলেই মদীনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। ইসলাম প্রসার লাভ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।
এটাই ছিল রাসূলের মদীনায় হিজরতের প্রাথমিক ভূমিকা।

তেইশতম আসর: মদীনাভিমুখে রাসূলের হিজরত

সাহাবাদের উপর যখন কাফিরদের নিপীড়নের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ তাদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। তিনি দেখলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে, ইসলামের দাওয়াত মদীনায় ব্যাপকতা লাভ করেছে। মুহাজিরদের অভ্যর্থনা ও আশ্রয়দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে এর মাটি ও মানুষ।
সাহাবাগণ রাসূলের আদেশে হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন। একের পর এক দলে দলে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।

বাকি থাকলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। এবং আরো কিছু সাহাবি যাদেরকে কাফিররা জোরপূর্বক আটকে রেখেছিল।
এদিকে কুরাইশদের মধ্যেও জানাজানি হয়ে গেল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুরক্ষিত এলাকায় হিজরত করতে যাচ্ছেন। এতে ইসলাম দুনিয়াব্যাপি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাই, সকলে মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল।
রাত্রিতে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা করল আর আল্লাহ তা স্বীয় রাসূলকে জানিয়ে দিলেন। এবং হিজরতের নির্দেশ দিলেন, আর সে রাতে নিজ বিছানায় ঘুমোতে বারণ করলেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর বিছানায় তাঁরই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে নির্দেশ দিলেন। এবং তার কাছে রক্ষিত, মানুষের আমানত ফেরত দিতে বললেন। রাসূলের নির্দেশ মত আলী রা. ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে রইলেন। আর দরজার বাইরে অনেকগুলো তলোয়ার উন্মুক্ত হয়ে থাকল।
হত্যার জন্য জড়ো হওয়া কাফিরদের ব্যূহ ভেদ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন। আল্লাহ তাদের চক্ষু অন্ধ করে দিলেন, এভাবেই তারা লাঞ্ছিত হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাথার উপর একমুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করে আবু বকর রা. এর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এবং রাতেই তারা খুব দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রা. চলতে চলতে সাউর গুহায় এসে পৌঁছালেন। কাফিরদের অনুসন্ধানে ভাটা পড়ার আগ পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই অবস্থান করেছেন।
এদিকে কুরাইশরা যখন তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে বলে নিশ্চিত হল, তাদের উত্তেজনা ও প্রতিশোধস্পৃহা বেড়ে গেল। তারা মক্কার চতুর্দিকে অনুসন্ধানকারীদের পাঠিয়ে দিল। পুরস্কার ঘোষণা করল, যে মুহাম্মদকে নিয়ে আসতে পারবে কিংবা তার সন্ধান দিতে পারবে, তাকে একশত উট পুরষ্কার দেয়া হবে। তার তালাশে তারা চারিদিক ছড়িয়ে পড়ল এবং তালাশ করতে করতে সাউর গুহার দ্বারপ্রানন্তে চলে গেল। কিন্তু আল্লাহ তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করলেন। আবু বকর বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা নিজ পায়ের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আবু বকর, সে দুইজন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ ?
আগে থেকে ঠিক করে রাখা রাহবার তিন দিন পর তাদের কাছে আসল, অতঃপর সকলে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।
রাস্তায় খোযায়ী বংশের উম্মে মাবাদ নামক এক নারীর তাঁবুর দেখা পেলেন। সে একটি বকরী দ্বারা রাসূলের বরকত লাভে ধন্য হয়েছে। ঘটনাটি এমন, তার একটি বকরী ছিল, যাতে এক ফোঁটা দুধও অবশিষ্ট ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীটি দোহন করার অনুমতি নিলেন, সাথে সাথে তার স্তন দুধে ভরে গেল। সে দুধ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে পান করালেন এবং তার সাথে যারা ছিল তারাও পান করল। সবশেষে তিনি নিজে পান করলেন। এরপর আবারো দোহন করে পাত্র পূর্ণ করে পথ চলা শুরু করলেন।
এদিকে সুরাকা বিন মালেক জানতে পারল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্র পথ ধরে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়েছেন। কুরাইশ কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারের প্রতি তার খুব লোভ জন্মেছিল। সে তীর ধনুক নিয়ে গোড়ার পিঠে চড়ে তাদের সন্ধানে রওয়ানা করল। এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে গেল, নবীজী আল্লাহর নিকট দুআ

করলেন ফলে তার ঘোড়ার সামনের পা দুটি মাটির নীচে দেবে গেল। সে বুঝে গেল এমনটি রাসূলের বদ দোয়ার কারণেই হয়েছে, রাসূল আল্লাহর তরফ থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত। সুতরাং তার কোনও ক্ষতি করা যাবে না। তাই সে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিল এবং এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল যে, আপনার অনুসন্ধানে আসা প্রতিটি দলকে আমি ফিরিয়ে দেব। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, ফলে তার ঘোড়ার পা মাটি থেকে বেরিয়ে আসল। ফেরার পথে রাসূলের সন্ধানে ধাবমান প্রতিটি দলকে সে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিল।

এদিকে আনসারগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রতীক্ষায় প্রতিদিন মদীনার প্রবেশ পথে এসে জড়ো হতেন । দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর গরম বেড়ে গেলে তারা বাড়ি ফিরে যেতেন।

নবুওয়তের তেরতম বছরের শুরুর দিকে রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ, সোমবার দিন হঠাৎ একটি ধ্বনি ভেসে এল রাসূল আসছেন, রাসূল আসছেন। এরই সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে রাসূলের আগমন বার্তা ও আল্লাহু আকবার শব্দের ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে লাগল। সকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইস্তেকবাল জানানোর জন্যে বের হয়ে পড়ল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবায় অবতরণ করলেন এবং সেখানে একটি মসজিদের ভিত্তি রাখলেন। এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ।

এখানে কয়েক দিন অবস্থান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হলেন। রাস্তায় জুমার সালাতের সময় হয়ে গেলে সাথে থাকা মুসলমানদের নিয়ে জুমার সালাত আদায় করলেন। এটাই ইসলামে সর্ব প্রথম জুমার সালাত। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দক্ষিণ দিক দিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন আর তখন থেকেই তার নামকরণ হয় মদীনাতুন্নাবী বা নবীর শহর। মদীনার বুকে বইতে শুরু করল প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তির সুবাতাস। ইসলামের সুরক্ষিত এক দুর্গে পরিণত হল আল-মদীনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসহ পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব দিকেই ইসলামের দাওয়াত ও আল-কুরআনের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার মানসে বেরিয়ে পড়ল খাঁটি ঈমানদার আল্লাহর অকুতোভয় সৈনিক, এক ঝাঁক দাওয়াত-কর্মী।

চব্বিশতম আসর : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন পদ্ধতি

দুনিয়ার বাস্তবতা, ভঙ্গুরতা ও অস্থায়িত্ব রাসূলের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ছিল। তাই তিনি নিঃস্ব ও গরিব লোকদের জীবনযাপন-পদ্ধতি প্রাধান্য দিতেন এবং তাদের মতই সাদাসিদা জীবন যাপন করতেন। আর প্রত্যাখ্যান করতেন ঐশ্বর্যবানদের প্রাচুর্যময় জীবনাচার। একদিন অভুক্ত থেকে সবর করতেন, অপর দিন খাবার গ্রহণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

তিনি নিজ উম্মতকে পার্থিব জগতের ফিতনা-প্রতারণা, চাকচিক্যে নিমগ্ন হওয়ার সমূহ ক্ষতি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় দুনিয়া- সুমিষ্ট, শ্যামল । আর আল্লাহ তোমাদেরকে সেখানে খলিফা হিসেবে রেখেছেন। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করবেন, তোমরা কি আমল কর। তোমরা দুনিয়া হতে সতর্ক থাক, সতর্ক থাক নারী হতেও । কারণ বনী ইসরাইলের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত ছিলেন যে, দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যার কোনো ঘর নেই, সেই ব্যক্তির জান্নাত পরকালের জান্নাতে যার কোনো অংশ নেই। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! একমাত্র আখেরাতের সুখ-ই প্রকৃত সুখ।

একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখিরাতকে তাঁর একান্ত লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা হতে একেবারে শূণ্য করে রেখেছেন নিজ অন্তরকে। তবে দুনিয়া তাঁর কাছে দৌড়ে আসত, আর তিনি তা পাশ কাটিয়ে যেতেন খুবই সতর্কতার সাথে। তিনি বলতেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক! আমি তো আরোহীতুল্য - যে ক্ষণিকের জন্য একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নিল, পরক্ষণেই তা ত্যাগ করে আবার যাত্রা শুরু করবে।

উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া রা. এর ভাই আমর বিন হারেস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় টাকা-পয়সা, গোলাম-বাঁদি, কিছুই রেখে যাননি। শুধু তাঁর আরোহণের একটি সাদা খচ্চর, ব্যক্তিগত হাতিয়ার আর একখণ্ড জমি যা তিনি সদকা করে দিয়েছিলেন (বিপদগ্রস্ত) পথিকদের কল্যাণার্থে।

এই হল সৃষ্টি সেরা রহমতে আলমের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার। তাঁর উপর আল্লাহ তাআলার শত কোটি সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। তিনি বাদশা-নবী হতে চাননি। তিনি বরং দাস-নবী হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত:

جَلسَ جِبْرِيْلُ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَر إِلى السَّماءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذا المَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ هَذِهِ السَّاعةِ . فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ؛ أَمَلِكًا أَجْعَلُكَ، أَمْ عَبْدًا رسولاً؟ فَقَالَ لَه جِبْرِيلُ: تَواضعْ لِرَبِّكَ يَا مُحمَّدُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ" :لَا بَلْ عَبْدًا رَسُولاً" [رواهُ ابنُ حبَّان وصحَّحهُ الألبانِيُّ.]

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম একদিন রাসূলের কাছে বসা। এমতাবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, একজন ফেরেশতা অবতরণ করছেন। জিবরাঈল তাকে বলেন, এ ফেরেশতা সৃষ্টির পর থেকে আজকের এ মুহূর্তের আগ পর্যন্ত কখনো অবতরণ করেননি। তিনি অবতরণ করে বলেন : মুহাম্মদ! আপনার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনাকে কি বাদশা-নবী বানিয়ে দেব? না, দাস-নবী? জিবরাঈল তাকে বললেন, মুহাম্মদ! আল্লাহর জন্য বিনয়ী হোন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, আমি বান্দা রাসূল হতে চাই।

এই হল রাসূলের পার্থিব জীবন-যাপন। যা ছিল বিনয় নির্লোভ ও দুনিয়া বিমুখতায় সমৃদ্ধ।

আয়েশা রা. বলেন :

تُوَفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُه ذُو كَبِدٍ إِلَّا شِطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْه حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُه فَفَنِي" [متَّفَقٌ عليْهِ.]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করলেন, আমার ঘরে একটি তাকের উপর রাখা সামান্য কিছু যব ছাড়া কোন প্রাণী খেতে পারে তেমন কিছু ছিল না। আমি তা-ই খেয়ে যাচ্ছিলাম অনেকদিন যাবৎ। একদিন মেপে দেখলাম, এর পরই শেষ হয়ে গেল।

ওমর রা. মানুষের প্রাচুর্য দেখে একদিন বললেন :

"لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ" [رَواهُ مسْلِم.]

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, পেট মোড়াতে মোড়াতে দিন পার করে দিয়েছেন, অথচ পেট ভরে খাবার জন্য নিম্ন মানের খেজুরের ব্যবস্থাও হয়নি।

আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوارِيه إِبِطُ بِلَالٍ" [رَواه التِّرمذِيُّ وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ]

আমাকে আল্লাহর পথে এতো ভয় দেখানো হয়েছে, যা অন্য কারও ব্যাপারে হয়নি। আল্লাহর জন্য আমাকে এতো কষ্ট দেয়া হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আমার উপর দিয়ে ত্রিশটি রাত ও ত্রিশটি দিন এমনও অতিবাহিত হয়েছে যে, আমার এবং বেলালের খাবারের জন্য কিছুই ছিল না। একমাত্র বেলালের বগলের ভেতর রক্ষিত সামান্য কিছু খাদ্য ছাড়া।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবার একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত অভুক্ত কাটাতেন। রাতের খাবারের জন্য কিছুই জুটত না। তাদের অধিকাংশ সময়ের জীবিকা ছিল যবের রুটি।

আনাস রা. বলেন :

لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ, وَلَمْ يَأْكُلْ خَبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ" [رواه البخاريُّ.]

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো টেবিল জাতীয় কিছুর উপর রেখে খাবার গ্রহণ করেন নি। এবং তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো পাতলা রুটি খাননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত চাটাই-এ বসতেন এবং তাতেই নিদ্রা যেতেন।

ওমর রা. বলেন :

دَخلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ. قَالَ: فَجلَسْتُ, فَإِذَا عَليهِ إِزَارُه، وَلَيْس عَلَيْهِ غَيرُه, وَإِذَا الحصِيرُ قَدْ أَثَّر فِي جَنْبِهِ صلى الله عليه وسلم ، وَإِذا أَنَا بقبْضَةٍ مِن شَعيرٍ نَحوِ الصَّاع، وقَرَظٍ() فِي نَاحِيةٍ فِي الغُرْفَةِ, وَإِذَا إِهَابٌ() مُعلَّقٌ، فَابتَدَرتْ عَيْنَايَ. فَقَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" : مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟" فَقُلتُ: يَا نبِيَّ اللهِ! وَمَا لِي لَا أَبْكِي, وَهَذَا الحصِيرُ قَدْ أَثَّر فِي جَنْبِكَ, وَهَذِهِ خِزانَتُك لَا أَرى فِيها إِلَّا مَا أَرَى، وَذاك كِسْرى وَقيْصرُ فِي الثِّمارِ والأَنْهارِ، وَأَنتَ نبِيُّ اللهِ وصَفْوتُه, وَهَذِهِ خزَانتُك! فَقَالَ صلى الله عليه وسلم" : يَا ابْنَ الخَطَّابِ! أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا ؟" [رواهُ ابْن مَاجَه وصحَّحه المنذريُّ.]

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে দেখি তিনি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। আমি তার পাশে বসলাম, তার উপর শুধুমাত্র একটি চাদর ছিল। চাটাই তার পার্শ্বদেশে দাগ কেটে দিয়েছে। আরো দেখলাম, ঘরের কোনায় রাখা এক সা পরিমাণ যব, ডালের ন্যায় সামান্য সালন উপকরণ আর ঝুলানো একটি চামড়া। এগুলো দেখে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর! কাঁদছ কেন ? আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার না কাঁদার কি আছে? এ চাটাই আপনার পার্শ্বদেশে দাগ কেটে দিয়েছে! আমার সামনে রক্ষিত আপনার এ সামান্যমাত্র জীবনোপকরণ। অথচ কেসরা-কায়সার তথা রোম-পারস্যের রাজা-বাদশারা বড় বড় বাগান আর নির্ঝরিণীতে বসবাস করছে। আপনি আল্লাহর নবী, সব নবীদের সরদার আর এ হলো আপনার সম্বল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে খাত্তাবের বেটা! তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট নও, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখেরাত।

পঁচিশতম আসর: ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রবেশ করলেন আর মদীনার অধিবাসীরা তাকে খুব আগ্রহ ও প্রফুল্ল চিত্তে বরণ করে নিল। যে কোন বাড়ি অতিক্রম করার সময় বাড়ির মালিক উটের লাগাম ধরে তার মেহমান হতে আবদার জানাতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপারগতা প্রকাশ করে বলতেন, আমার উটের পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট। উট চলতে চলতে মসজিদের নিকট আসতেই পা গেড়ে বসে পড়ল। অতঃপর উঠে দাঁড়াল, একটু সামনে গিয়ে, পুনরায় আগের জায়গায় এসে বসে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মামাদের -বনী নাজ্জারের- মেহমান হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমার আত্মীয়ের মধ্যে কার বাড়ি অতি নিকটে? আবু আইয়ূব আনসারী রা. বললেন, আমার, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতে মেহমান হলেন।

মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিলেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উট পা গেড়ে বসে পড়েছিল সেখানেই মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান- হল। জায়গাটি ছিল মূলত: দুই ইয়াতিম কিশোরের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিটি কিনে নিলেন। সকলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মসজিদ নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। অতঃপর মসজিদের পাশে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য ঘর নির্মাণ করলেন। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে, আবু আইয়ূব রা. এর বাড়ি ছেড়ে এখানে চলে এলেন। সালাতের সময় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য আজানের অনুমোদন ও তার সূচনা করলেন।

অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করলেন। তাদের নব্বই জনের মাঝে এ সম্পর্ক কায়েম করলেন। (এর অর্ধেক ছিল আনসার, বাকি অর্ধেক মুহাজির) তারা একে অপরের যেমন ছিলেন সহযোগী, তেমনি ছিলেন হিতাকাঙ্ক্ষী। মৃত্যুর পরে নিকট আত্মীয়ের বিপরীতে তাদের মধ্যেও উত্তরাধিকার বিধান চালু ছিল। বদর যুদ্ধ পর্যন্ত এ নীতি বলবৎ থাকে । যখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. ﴿الأحزاب٦﴾

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরদের চেয়ে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর, তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দয়া- দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তাহলে করতে পার। এটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। {সূরা আহযাব:৬}

তখন থেকে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। আত্মীয়দের ভেতর-ই বণ্টন হতে থাকে উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসবাসকারী ইহুদিদের সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। তাদের আলেম ও পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম খুব দ্রুত এবং সর্ব প্রথম ইসলামে দীক্ষিত হন। বাকিরা কাফির অবস্থাই থেকে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসবাসরত মুহাজির, আনসার এবং ইহুদিদের মাঝে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার একটি সনদ তৈরি করলেন। যার গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কিছু ধারা কতিপয় সিরাত গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে। যার প্রধান প্রধান অংশ নিম্নে তুলে ধরা হল।

-অন্য সকল জাতি ও গোত্রের বিপরীতে মুহাজির ও আনসার মুসলমানগণ এক জাতি ও এক বংশের ন্যায়।

-মুসলমানরা নিজেদের ভেতর ঋণগ্রস্ত ও অধিক সন্তনাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য করতে কার্পণ্য করবে না।

-মুসলমানগণ সকলে মিলে অত্যাচারী, অবাধ্য. দুষ্কৃতিপ্রবণ ও নিজেদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে প্রতিহত করবে। যদিও সে তাদের কারো সন্তান হয়।

- মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফেরের পরিবর্তে হত্যা করবে না। মুসলমানের বিপরীতে কোন কাফিরকে সাহায্যও করবে না।

-আল্লাহর নিরাপত্তা সবার জন্য সমান। একজন নিম্ন স্তরের মুসলমানও যে কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই।

- ইহুদীদের যে আমাদের অনুসরণ করবে, আমরা তাকে সাহায্য করব, তার জন্য উদারতা দেখাব। তার উপর জুলুম করব না, তার বিপরীতে অন্য কাউকে সাহায্যও করব না।

- মুমিনদের সন্ধি একটিই। আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের সময় কোন মুসলমান এককভাবে কাউকে নিরাপত্তা দেবে না। যাকে নিরাপত্তা দেয়া প্রয়োজন সম্মিলিতভাবে ইনসাফের ভিত্তিতে দেয়া হবে।

-মুসলমানদের ভেতর কোন মতবিরোধের সৃষ্টি হলে, তার ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপর সোপর্দ করা হবে।

- আউফ বংশের ইহুদিরা মুসলমানদের স্বজাতি। তারা তাদের ধর্ম পালন করবে, মুসলমানগণ নিজেদের ধর্ম পালন করবে। তাদের এবং তাদের গোলামের ব্যাপারে একই নীতি প্রযোজ্য। তবে, যে নিজের উপর অবিচার করবে, অবাধ্য হবে, সে নিজকে এবং নিজ পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

- ইহুদিদের যারা বন্ধু, তারাও তাদের মত। তাদের কাউকে মুহাম্মাদের অনুমতি ব্যতীত মদীনা হতে বহিষ্কার করা যাবে না।

- প্রতিবেশীও নিজের মত। কেউ কারো উপর জুলুম করবে না। কেউ কারো অবাধ্য কিংবা ক্ষতির কারণ হবে না।

- অনুমতি ব্যতীত কারো সংরক্ষিত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

এ ধরনের আরো কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যার দ্বারা তিনি মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। মুসলমান ও ইসলামি রাষ্ট্র তথা মদীনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর ভেতর ঐক্যের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিচার ফয়সালা ও বিধানের ক্ষেত্রে সকলকে রুজু করতে হবে, আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট। বিশেষ করে যখন কোন ঝগড়া কিংবা বিরোধের সৃষ্টি হয়।

এ সনদে প্রতিটি মানুষের আকীদা, ইবাদত ও নিরাপত্তার অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে সকল মানুষের মৌলিক অধিকারে সাম্যতাও।

একজন চিন্তাশীল গবেষক মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক প্রাথমিক মূলনীতিই এতে খুঁজে পাবেন। যারা সাধারণত: মানবাধিকার বিষয়ে সোচ্চার কণ্ঠ তারা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই মানবাধিকারের গোড়াপত্তন করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী তা ঢেলে সাজিয়েছেন। বরং মদীনার এ সনদই ইনসাফপূর্ণ মানবাধিকার ও প্রতারণামূলক মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড। পক্ষান্তরে যে মানবাধিকারের প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন আহ্বান জানাচ্ছে, যাকে তারা মানবাধিকার বলে দাবি করছে, তা হচ্ছে মূলত: অন্যায়, অবিচার ও মানবগোষ্ঠির অধিকার হরণ এবং একজাতি দ্বারা অন্য জাতিকে নিষ্পেষিত ও নিঃশেষ করণের মিথ্যা মানবাধিকার।

ছাব্বিশতম আসর: সূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বীরত্ব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাপেক্ষা বীরত্বের অধিকারী একজন সাহসী মানুষ। যার প্রমাণ, এক আল্লাহর ইবাদত এবং তার তাওহীদের ঝান্ডা নিয়ে তাবৎ কাফির সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় তিনি একাই এগিয়ে গিয়েছেন। তারা সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরোধিতা করেছে, এক অবস্থান থেকে যুদ্ধ করেছে, নির্যাতন নিপীড়নের সব পদ্ধতি তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে বার বার। তাদের এত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তাঁকে ভীত করতে পারেনি মোটেও। মুহূর্তের জন্যেও বিরত রাখতে পারেনি তাঁর দাওয়াত-কর্ম থেকে। তাদের নির্যাতন যত বেড়েছে তাঁর কর্মস্পৃহা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। দাওয়াতি চাঞ্চল্য আরো গতিময় হয়েছে। তিনি সত্যকে আঁকড়ে ধরেছেন আরও দৃঢ়তার সাথে। তাদের লোভ প্রদর্শন ও চ্যালেঞ্জের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে ঘোষণা করেছেন :

আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য, আর বাঁ হাতে চন্দ্র এনে দিয়ে আমাকে এ দাওয়াত-কর্ম পরিত্যাগ করতে বলে, তবুও আমি তা ত্যাগ করব না। যতক্ষণ না, আল্লাহ তাআলা তার দীনকে জয়ী করেন, অথবা আমি ধ্বংস হয়ে যাই।

আনাস রা. বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجودَ النَّاسِ, وَكَانَ أَشْجَع النَّاسِ، ولقَدْ فَزِعَ أهلُ المدِينةِ ذَاتَ ليلةٍ, فَانْطلَق ناسٌ قِبَل الصوْتِ, فتلقَّاهُمْ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاجِعًا، وَقَدْ سَبقهُمْ إِلَى الصَّوْتِ, وَهُو عَلى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحةَ عُرْيٍ، فِي عُنقِه السيفُ، وَهُوَ يقُول: "لَمْ تُرَاعُوا، لَـمْ تُراعُوا" [مُتَّفقٌ عليه] أَيْ لَا تَخَافُوا, لَا تَخَافُوا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন সুন্দরতম মানুষ, বড় দানশীল, ও সর্বাপেক্ষা সাহসী। এক রাতের ঘটনা, হটাৎ চিৎকার শুনে, মদীনার জনগণ আতঙ্কিত হয়ে আওয়াজের উৎসের দিকে ছুটে চলল। গিয়ে দেখতে পেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আগেই সেখানে পৌঁছে ফিরে আসছেন। তিনি আবু তাল্হার ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, তার কাঁধে ছিল তরবারি। আর মুখে বলছিলেন : ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। {বোখারি ও মুসলিম}

আল্লামা নববী রহ. বলেন, এখানে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যেমন:

রাসূলের বীরত্ব, তিনি সকলের আগে এবং সব চেয়ে দ্রুত শত্রু অভিমুখে ছুটে গিয়েছেন। অবস্থার সত্যতা যাচাই করেছেন এবং অনেকের পৌছার পূর্বেই তিনি ফিরে এসেছেন।

জাবের রা. বলেন :

كُنَّا يومَ الخَنْدَقِ نَحْفِرُ، إِذْ عَرضَتْ كُديةٌ شَدِيدةٌ. فَجاءُوا بالنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: هَذِهِ كُديَةٌ عَرضَتْ فِي الخَنْدقِ. فَقالَ صلى الله عليه وسلم" : أَنَا نَازِلٌ" ثُمَّ قَام، وبطنُه معصوبٌ بحجَرٍ، ولبثْنَا ثلاثةَ أَيَّامٍ لا نذُوقُ ذَوَاقًا, فأخذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المعْوَلَ، فَضربَ في الكُديةِ، فَعاد كثيبًا أَهْيَل أَوْ أَهْيمَ" [رواه البخاريُّ]

আমরা খন্দকের দিন পরিখা খনন করছিলাম। হটাৎ একটি বিশাল শক্ত পাথর বের হয়ে এল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে এ বিষয়ে অবহিত করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আসছি। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর

পেটে ছিল পাথর বাঁধা। আমরা সকলেই তিন দিন যাবৎ কোন খাবার গ্রহণ করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুড়াল হাতে নিয়ে খুব জোরে আঘাত করলেন আর পাথরটি বালু কণার ন্যায় টুকরো টুকরো হয়ে গেল। {সহিহ বোখারি}

এ ঘটনা থেকে রাসূলের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন থেকে কঠিনতম মুহূর্তেও স্বীয় বীরত্ব ও সাহসের প্রমাণ দিয়েছেন। যত-ই কঠিন মুহূর্ত হোক-না-কেন তিনি পিছপা হতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা, সম্মান, দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের গুরুত্ব কেবল সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে, যাকে আল্লাহ তাআলা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নিয়োজিত করেছেন।

এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি একবারের জন্যও প্রমাণ করতে পারেনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অবস্থান হতে এক আঙুল কিংবা এক হাত পরিমাণও পিছু হটার চিন্তা করেছিলেন। কি কারণে সাহাবায়ে কেরাম চক্ষু ও অন্তর ভরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করতেন? কি জন্যে ছোট-বড় সকলেই রাসূলের ইশারাতে প্রতিযোগিতা করে ছুটে আসতেন? শুধু কি এ জন্যই যে, তিনি একজন রাসূল? না, বরং তারা রাসূলের বীরত্ব ও সাহসের কাছে নিজেদেরকে দেখতে পেতেন শূন্য-সদৃশ। অথচ তাদের মধ্যেও এমন বীর ও দুঃসাহসী পুরুষ বিদ্যমান ছিল যাদের মাধ্যমে মানুষ বীরত্বের উদাহরণ পেশ করত।

এ প্রসঙ্গে আলী রা. বলেন :

كُنَّا إِذَا احمرَّ البأْسُ، ولَقِيَ القومُ القومَ, اتَّقيْنا برسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَما يَكُونُ مِنَّا أحدٌ أَدْنَى إِلَى العدوِّ مِنْهُ. [رَوَاهُ أَحْمدُ وَالنِّسائِيُّ.]

যখন যুদ্ধ কঠিন আকার ধারণ করত, আমরা নিজেদেরকে রাসূলের দ্বারা হেফাযত করতাম। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হতেন) তিনিই আমাদের চেয়ে শত্রুর বেশি নিকটবর্তী থাকতেন।

আলী রা. আরো বলেছেন :

لَقَدْ رأَيتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ, وَنَحْنُ نَلُوذُ بالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلى العَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَأْسًا" [رَواه أحمدُ.]

বদরের যুদ্ধে দেখেছি, আমরা রাসূলের দ্বারা নিজেদেরকে রক্ষা করছি। শত্রুপক্ষের অতি নিকটে তিনিই ছিলেন। যুদ্ধে তিনি সকলের চেয়ে বেশি বীরত্বের প্রমাণ দিতেন।

উহুদ যুদ্ধে অভিশপ্ত উবাই বিন খালফ ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশে নিকটবর্তী হতে লাগল। সে বলছিল, মুহাম্মদ! তুমি যদি বেঁচে যাও, তাহলে আমার রক্ষা নেই। সাহাবারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ কি তার উপর দয়া দেখাতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আসতে দাও। সে নিকটবর্তী হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেস বিন সাম্মা থেকে একটি বর্শা নিয়ে ঝাঁকুনি দিলেন, সাথে সাথেই সাহাবায়ে কেরাম তার নিকট হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গর্দানে একটি খোঁচা মারলেন, আর তাতেই সে ঘোড়া হতে কয়েকটি পলটি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বলতে লাগল : মুহাম্মদ আমাকে হত্যা করেছে। তারা বলল : তোমার কিছু হয়নি। সে বলল : তোমরা বল কি! এ যন্ত্রণা যদি সমগ্র মানুষের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়, তবে সকলেই মারা যাবে। তোমরা কি ভুলে গেছ! সে কি আমাকে বলেনি : আমি তোমাকে হত্যা করব। আল্লাহর

শপথ করে বলছি, সে যদি আমার প্রতি থুতুও নিক্ষেপ করত, আমি মরে যেতাম। অতঃপর ফেরার পথে সে মারা গেল।
হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানগণ যখন দৌড়ে পালাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জায়গাতে স্থির দাড়িয়ে ছিলেন। আর বলছিলেন,
আমি সত্যিকারার্থে নবী, মিথ্যুক নই : আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। (ভীরু নই)।

সাতাশতম আসর: বদর যুদ্ধ

হিজরতের দ্বিতীয় বছর রমযান মাসে সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধ। এর কারণ, সিরিয়া হতে কুরাইশের বিশাল এক বণিক দল বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র এবং রসদ নিয়ে মক্কায় আসছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পথ রুদ্ধ করতে বের হলেন। তাঁর সাথে ছিল তিন শত তেরো জনের একটি দল। কুরাইশ দলের নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান। সে খুব সজাগ ও সতর্কতার সাথে পথ চলছিল। যার সাথেই দেখা হত, মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। এক সময় মুসলমানদের বের হওয়ার সংবাদও জেনে গেল। তখন সে বদরের খুব নিকটবর্তী জায়গায় ছিল। সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে ফেলল, সামান্য পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগল। আর বদরের সংকটপূর্ণ রাস্তা ত্যাগ করল। অতঃপর এ সংবাদ দিয়ে এক ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করল যে, তোমাদের সম্পদ হুমকির মুখে, মুসলমানরা আক্রমণের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পিছু পিছু ধাওয়া করছে।
এ সংবাদ মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে সকলেই আবু সুফিয়ানকে সাহায্যের জন্য বিপুল উৎসাহে এগিয়ে আসল। আবু লাহাব ছাড়া মক্কার নেতৃবর্গের কেউ বাকি ছিল না। আশ পাশের সকল গোত্রের লোকজনকে তারা সাথে নিয়ে নিল, শুধু আদি বংশের লোক ছাড়া কুরাইশ অঞ্চলের সকলেই তাতে অংশগ্রহণ করল।
তারা জুহফা নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারল, আবু সুফিয়ান নিরাপদ অবস্থানে চলে গিয়েছে এবং তাদের মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য বলেছে।
সকলে মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল, কিন্তু বাধ সাধল আবু জাহেল। সে সবাইকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করল। বনু জুহরা আবু জাহেলের ডাকে সাড়া না দিয়ে চলে গেল, তাদের সংখ্যা ছিল তিন শত। বাকিরা সামনে অগ্রসর হতে লাগল, তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। অবশেষে বদর প্রান্তরকে বেষ্টিত করে-রাখা পাহাড়ের পিছনে বদরের বাইরে প্রশস্ত ময়দানে তারা অবস্থান নিল।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের মধ্যে যুদ্ধ এবং আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গিত হওয়ার বিপুল আগ্রহ ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করলেন তিনি। তাদের এ ভূমিকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব খুশি করল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা অগ্রসর হও, এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তাআলা আমাকে দুটি দলের যে কোন একটির উপর জয়ী করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমার মনে হচ্ছে, আমি তাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করছি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে মদীনার নিকটবর্তী বদর প্রান্তরে অবতরণ করলেন। হুবাব ইবনে মুনজির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো অগ্রসর হয়ে শত্রু পক্ষের অতি নিকটে পানির স্থানে অবস্থান নেয়ার জন্য পরামর্শ দিল। উদ্দেশ্য মুসলমানগণ নিজ নিজ পাত্রে পানি জমা করে রাখবে এবং কূপের অবশিষ্ট পানি নষ্ট করে দেবে। ফলে শত্রু পক্ষ পানিবিহীন রয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুবাব বিন মুনজিরের পরামর্শ অনুসারে কাজ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -রমযানের সতের তারিখ-জুমার রাতে তথা বদরের রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহকে ডাকলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার সাহায্য প্রার্থনার করলেন, আর এভাবেই তিনি সারা রাত পার করলেন।

মুসনাদে আলী ইবনে আবী তালেব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম, আমরা সকলেই ঘুমিয়ে আছি, শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি একটি গাছের নীচে সালাত আদায় করে কেঁদে কেঁদে সকাল করলেন।

মুসনাদে আরো আছে, তিনি বলেছেন : বদরের রাতের বৃষ্টিতে আমাদেরকে কাঁপুনিতে পেয়ে বসল। আমরা সকলে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য গাছের নীচে এবং তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত কাটালেন, আল্লাহকে ডেকে ডেকে। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ! তুমি যদি এ জামাতকে ধ্বংস করে দাও, তবে এ যমীনে তোমার আর ইবাদত করা হবে না। সকাল হলে, তিনি সবাইকে ডেকে তুললেন : সালাত, হে আল্লাহর বান্দারা। সবাই গাছের নীচ এবং তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন এবং সকলকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী এবং মুমিনদেরকে নুসরত ও সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿الأنفال-٩ ১০﴾

যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন- আমি তোমাদেরকে পর পর এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব। আল্লাহর এমনটি করার উদ্দেশ্য, তোমাদেরকে সুসংবাদ দান করা। এবং এর দ্বারা যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে। সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। {সূরা আনফাল:৯-১০}

আরো ইরশাদ :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿آل عمران১২৩﴾

তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বদরে অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল, সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

তিনি আরো বলেন :

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿الأنفال১৭﴾

তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তাদের হত্যা করেছেন। যখন তুমি নিক্ষেপ করেছ, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, নিক্ষেপ করেছেন আল্লাহ, এবং যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে, নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী পরিজ্ঞাত।

মল্ল যুদ্ধের মাধ্যমে কিতাল শুরু হল। হামজা রা. হত্যা করলেন শাইবা বিন রাবীআকে, আলী রা. হত্যা করলেন ওলীদ বিন উতবাকে। আর কাফিরদের উতবা বিন রাবীআ এবং মুসলমানদের উবাইদা বিন হারিস আহত হলেন।

অতঃপর মূল যুদ্ধ শুরু হল এবং ক্রমেই প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করলেন। তারা মুসলমানদের হয়ে যুদ্ধ করল এবং তাদের অন্তরে সাহস জোগাল। সামান্য সময়ের ব্যবধানে কাফিররা পরাস্ত হয়ে গেল এবং পিঠ ফিরে পালাতে লাগল। মুসলমানগণ তাদের হত্যা আর বন্দী করার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করল।

সত্তরজন কাফির নিহত হল। যাদের মধ্যে উতবা, শাইবা, ওলীদ বিন উতবা, উমাইয়া বিন খালফ, তার ছেলে আলী, হানযালা বিন আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহেলও ছিল । এবং আরো সত্তরজন গ্রেফতার হল।

বদর যুদ্ধের ফলাফল : মুসলমানদের মনোবল এবং শক্তি বৃদ্ধি পেল। তারা মদীনা ও তার আশ পাশে ভীতি সঞ্চারক দলে পরিণত হল। আল্লাহর উপর তাদের আস্থা আরো বৃদ্ধি পেল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করেন, যদিও তারা সংখ্যায় কম থাকে। এর দ্বারা মুসলমানদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও অর্জিত হল। তারা জেনে গেল, কীভাবে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়, কীভাবে তাদের ঘেরাও করতে হয়, কীভাবে তাদেরকে যুদ্ধের সহায়ক বস্তু হতে বঞ্চিত করা যায় এবং কীভাবে তাদের মুকাবিলায় টিকে থেকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা যায়।

আটাশতম আসর: উহুদ যুদ্ধ

হিজরতের তৃতীয় বছর শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। যেহেতু বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছে এবং তারা এমনভাবে পরাভূত হয়েছে, যেমনটি এরপূর্বে আর কখনো ঘটেনি, তাই তারা প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প করল এবং হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চাইল।

আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বিরাট এক বাহিনী তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলল। সে কুরাইশ এবং পার্শ্ববর্তী শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ও শরণার্থীদের সমন্বয়ে প্রায় তিন হাজারের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করল। তারা নিজ স্ত্রীদেরও সাথে নিয়ে নিল, যাতে যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করতে না পারে এবং কমপক্ষে তাদের স্ত্রীদের রক্ষার্থে ময়দানে টিকে থাকে। অতঃপর তাদের নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হল এবং মদীনার নিকটবর্তী উহুদ পাহাড়ের নিকট অবস্থান নিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। মদীনায়ই অবস্থান নেবেন, না তাদের মোকাবেলায় বেরিয়ে যাবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল মদীনায় থেকে রক্ষণাত্মক ভূমিকায় যুদ্ধ করা। অর্থাৎ শত্রুরা মদীনা আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করা হবে। কিন্তু বেশ কয়েকজন বড় বড় সাহাবি বের হয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজার সাহাবির একটি দল নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। দিবসটি ছিল শুক্রবার। যখন মদীনা ও উহুদের মাঝামাঝি পৌঁছলেন, আব্দুল্লাহ বিন উবাই-মুনাফিক- এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে ফিরে গেল, এবং বলল, আপনি আমার বিরোধিতা করেন এবং অন্যের কথা শোনেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বের হয়ে উহুদের এক উপত্যকায় অবতরণ করলেন। উহুদকে তিনি পেছনে রেখে লোকদের তাঁর আদেশ পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে বললেন। শনিবার সকালে সাত শত সৈন্য নিয়ে তিনি কিতালের সিদ্ধান্ত নিলেন যাদের মাত্র পঞ্চাশ জন ছিল অশ্বারোহী।

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে তীরন্দাজদের-যার সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ- আমীর নিযুক্ত করে আদেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন নিজ অবস্থানে দৃঢ় থাকে। শত্রুরা মুসলিম সৈন্যদের উঠিয়ে নিয়ে

যেতে দেখলেও যেন কেউ নিজ স্থান ত্যাগ না করে। তারা ছিল সৈন্যবাহিনীর পেছন দিকে তাই তিনি তাদেরকে শত্রুর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাদের প্রতিহত করার নির্দেশও দিয়েছিলেন যাতে শত্রুপক্ষ পেছন দিয়ে মুসলমানদের আঘাত করতে না পারে।
যুদ্ধ শুরু হল, দিনের প্রথমাংশেই মুসলমানদের বিজয় সাধিত হয়ে গেল। আর মুশরিকরা পরাজিত হয়ে তাদের নারীদের সাথে গিয়ে মিলিত হল। তীরন্দাজ সৈন্য বাহিনী শত্রুপক্ষের পরাজয় দেখে, রাসূলুল্লাহ তাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ভুলে গিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন। তারা বলল, হে আমাদের কওম! গনীমত। দলনেতা তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা সেদিকে কর্ণপাত করেনি। তারা ভাবল, মুশরিকদের আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তাই তারা গনীমত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে নেমে এল। ফলে গিরিপথ অরক্ষিত হয়ে পড়ল। এদিকে মুশরিকদের অশ্বারোহী দল আবার ফিরে এসে দেখল তিরন্দাজরা তাদের অবস্থানে নেই এবং গিরিপথ ফাঁকা। তখন তারা সে দিক দিয়ে আগে বাড়ল। তাদের পেছনের সৈন্যরা এসে তাদের সাথে মিলিত হলে তারা আরো শক্তিশালী হল। এরপর মুসলমানদের ঘেরাও করে তীব্র আক্রমণ চালাল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শহীদের মর্যাদা দান করলেন। সাহাবাগণ ময়দান ছেড়ে পেছনে হটে গেলেন। এ সুযোগে মুশরিকরা রাসূলের অতি নিকটে পৌঁছে গেল এবং তাঁর পবিত্র চেহারা আহত করে দিল। তাঁর ডান চোয়ালের দাঁত ভেঙে ফেলল। মাথার হেলমেট ভেঙে চুরমার করল। একটি পাথর আঘাত করে তাঁর শরীরের এক পাশে প্রচণ্ড ক্ষতের সৃষ্টি করল। আবু আমের নামক জনৈক পাপিষ্ঠ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য খনন করা একটি গর্তে তিনি পড়ে গেলেন। আলী রা. এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরলেন আর তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাসূলকে কোলে তুলে নিলেন। মুসআব বিন উমায়ের তার সামনে শহীদ হয়ে গেলেন। এসময় যুদ্ধের ঝাণ্ডা আলী বিন আবু তালেবের হাতে তুলে দেয়া হল। অন্যদিকে শিরস্ত্রাণের দুটি আংটা তাঁর চেহারায় বিদ্ধ হয়ে গেল। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ আংটাদ্বয় টেনে বের করলেন, এবং আবু সাঈদ খুদরী রা. এর পিতা মালেক বিন সিনান তার গণ্ডদেশ থেকে রক্ত চুষে নিলেন। মুশরিকরা তাঁকে হাতের নাগালে পেয়ে গেল। তারা ঐ বাধা অতিক্রম করতে চাইল আল্লাহ তাদের ও তাঁর মাঝে সৃষ্টি করেছেন। এর মুকাবিলায় মুসলমানদের দশজনের একটি ছোট দল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন, এবং তাদের সকলেই শাহাদত বরন করলেন, তালহা তাদের মুকাবিলায় অবিচল থাকলেন।
আবু দুজানা রা. স্বীয় পিঠ ঢাল বানিয়ে রাসূল স.-কে হেফাযত করলেন। বিরামহীনভাবে তীর তার দেহে বিদ্ধ হতে থাকল, আর তিনি নিজ স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেদিন কাতাদা বিন নোমান চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলে নবীজী তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। তার চক্ষুদ্বয় আগের থেকেও সুস্থ ও সুন্দর চোখে পরিণত হয়ে গেল।
এদিকে শয়তান চিৎকার করে ঘোষণা করল, মুহাম্মদ নিহত হয়ে গিয়েছেন। এতে অনেক মুসলমানের মনোবল ভেঙে গেল। অনেকে যুদ্ধ ছেড়ে চলে গেলেন। আল্লাহর সিদ্ধান্ত যা ছিল তাই হলো।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁকে হেলমেটের নীচে প্রথমে চিনতে পারেন কাব বিন মালেক। তাঁকে দেখে তিনি চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, হে মুসলমানবৃন্দ! সুসংবাদ গ্রহণ কর, এই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ইশারা করে তাকে চুপ থাকতে বললেন। মুসলমানেরা তার পাশে এসে জমায়েত হলেন এবং তাঁর সাথে একই গিরিপথে অবতরণ করলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, ওমর, আলী, হারেছ বিন ছাম্মাহসহ আরো অনেকে ছিলেন। অতঃপর তারা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলে উবাই বিন খালফ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এদিকে আসছিল। রাসূলুল্লাহ তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন। বর্শা তার কণ্ঠাস্থিতে আঘাত করল, ফলে সে পরাজিত হয়ে নিজ কওমের দিকে পালিয়ে গেল। এবং মক্কায় ফেরার পথে মারা গেল।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে ফেললেন। যখমের কারণে বসে সালাত আদায় করলেন। হানযালাহ রা. এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রী সহবাসের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। যুদ্ধের ঘোষণা শুনে গোসলের পূর্বেই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁকে ফেরেশ্তারা গোসল দিয়েছেন। মুসলমানরা মুশরিকদের পতাকাবাহীকে হত্যা করেছিল। উম্মে ইমারা-নাসাবিয়্যা বিনতে কাব আল মাযিনিয়্যা কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন। তাকে আঘাত করেছিল আমর বিন কামিআহ। তিনি খুবই মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন।
মুসলমানদের মধ্যে যারা শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল সত্তরের কিছু বেশি। আর মুশরিকদের মধ্যে নিহত হয়েছিল তেইশ জন। কুরাইশরা মুসলমানদের লাশ মারাত্মকভাবে বিকৃত করেছিল।
শাহাদাত বরণকারী মুসলমানদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন।

উনত্রিশতম আসর: উহুদযুদ্ধের শিক্ষা

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. যাদুল মাআদ গ্রন্থে উহুদ যুদ্ধ থেকে শিক্ষণীয় অনেকগুলো চমৎকার বিষয় উল্লেখ করেছেন। পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে আমরা তার কিছু নিম্নে তুলে ধরছি।
প্রথমত: মুমিনদেরকে অবাধ্যতা, বিবাদ ও ব্যর্থতার মন্দ পরিণতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, তাদের উপর যে বিপদ ও মুসীবত আপতিত হয়েছে তার একমাত্র কারণ পারস্পরিক মতভেদ ও অবাধ্যতা।
এ বিষয়টিই পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ (آل عمران১৫২

আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, এমনকি তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা পছন্দ কর তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল কামনা করছিল এবং কতক পরকাল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের হতে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। আর আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।
{সূরা আলে ইমরান: ১৫২}
যখন তারা রাসূলের অবাধ্যতা, তার সাথে মতবিরোধ, ও ব্যর্থতার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করলেন, তখন থেকে তাঁরা অধিক সতর্ক ও চৈতন্যসম্পন্ন হয়ে গেলেন।
দ্বিতীয়ত: রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীগণের ব্যাপারে আল্লাহর হিকমত ও রীতি এই চলে এসেছে যে, তাদেরকে একবার বিজয় দেবেন তো আরেকবার মাহরুম করবেন, তবে শেষ পরিণতি তাদের পক্ষেই যাবে। কেননা, তারা যদি সর্বদা বিজয় লাভ করতে থাকে, তবে তাদের সাথে

মুসলিম ও অমুসলিম একসাথে মিশে যাবে। অতঃপর সত্যবাদীকে অসত্যবাদী থেকে আলাদা করা দুষ্কর হবে।

তৃতীয়ত: সত্যিকার মুমিন, মিথ্যাবাদী মুনাফিক থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা, মুসলমানদেরকে বদর দিবসে যখন বিজয় দান করা হল, প্রকৃত অর্থে যারা ইসলামে প্রবেশ করেনি, তারাও তাদের সাথে বাহ্যিকভাবে মিশে গেল। তাই আল্লাহর হিকমত এই ছিল যে, তার বান্দাদেরকে কষ্ট-যাতনা ভোগ করাবেন, যা মুমিন থেকে মুনাফিককে পৃথক করে দেবে। মুনাফিকরা উহুদযুদ্ধে তাদের মাথা উঁচু করেছিল, এবং যা তারা গোপন করত তা বলে ফেলেছিল। মুমিনরা বুঝতে পারলেন তাদের নিজের ঘরেই শত্রু রয়েছে। অতঃপর তারা তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হলেন, এবং তাদের বিষয়ে সতর্ক হয়ে গেলেন।

চতুর্থত: যারা আল্লাহর বন্ধু ও তাঁর বাহিনীভুক্ত তাদের দাসত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। সুখে ও দুঃখে, পছন্দে ও অপছন্দে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সফলতা অর্জনে ও শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হওয়া তথা সর্বাবস্থায় তাদের দাসত্ব বজায় থাকে কি-না তা পরখ করে নেওয়া। সুতরাং পছন্দ ও অপছন্দ সর্ব অবস্থায় যদি মুমিনরা আনুগত্য ও দাসত্বের উপর দৃঢ় থাকতে পারে তবেই তারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহর বান্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

পঞ্চমত: যদি আল্লাহ তাআলা সর্বদা তাদের সাহায্য করেন এবং সর্বস্থানে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং সব সময় শত্রুদের বিপক্ষে তাদের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা দান করেন তাহলে তাদের অন্তর অবাধ্যতা ও অহংকারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং বান্দাদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে তাদের সুখ-দুঃখ, স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠত: যখন আল্লাহ তাআলা তাদের জয়-পরাজয় ও বিপর্যয় দিয়ে পরীক্ষা করবেন তখন তারা দীনতা-হীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত হয়ে থাকবে এবং তার নিকট সাহায্য ও ইজ্জত প্রার্থনা করবে।

সপ্তমত: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য অনেক মর্যাদার স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেখানে তারা বিপদ-আপদ ও পরীক্ষায় আপতিত হওয়া ব্যতীত শুধুমাত্র তাদের আমল দিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। ফলে তিনি তাদেরকে বিপদ-আপদ ও পরীক্ষায় নিপতিত করেন এবং সেগুলো তাকে সেই মর্যাদার স্তরে পৌঁছে দেয়।

অষ্টমত: সুস্থতা, স্বচ্ছলতা, মদদপুষ্টতা ও পরমুখাপেক্ষিতা মুক্ত থাকার কারণে মানবাত্মা ক্রমান্বয়ে অবাধ্য ও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। আর এটি এমন এক রোগ যা মানুষকে তার প্রতিপালক আল্লাহ ও পরকালের দিকে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আমল ও চেষ্টা-সাধনা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যদি মানুষকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে চান তিনি তাকে নানাবিধ বিপদ ও পরীক্ষায় পতিত করেন যেটি তার সেই রোগের ঔষধ হিসাবে কাজ করে। তখন সেই বিপদ ও পরীক্ষাটি তার জন্যে সেই ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যে অসুস্থ ব্যক্তিকে তিক্ত ঔষধ সেবন করায় এবং কষ্টদায়ক ধমনিসমূহ কেটে দেয়। উদ্দেশ্য রোগের উৎসগুলো বের করে সুস্থ করে তোলা। আল্লাহ তাআলা যদি মানুষকে তার নিজ অবস্থার উপর ছেড়ে দেন তাহলে তার প্রবৃত্তি তার উপর বিজয়ী হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

নবমত: শাহাদাত বরণ আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর ওলীদেরকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। শাহাদাত বরণকারী তাঁর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। সিদ্দীকিয়্যতের স্তরের পরই শাহাদাতের স্থান। আর শত্রুচাপিয়ে দিয়ে বিপদ আরোপিত করা ব্যতীত ঐ স্তরে পৌঁছার আর কোন রাস্তা নেই।

দশমত: আল্লাহ যখন তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করতে চান তখন তিনি তাদের দিয়ে এমনসব কাজ সম্পাদন করান যা তাদের ধ্বংসকে অনিবার্য করে তোলে। কুফরির পর ধ্বংসের মারাত্মক কারণসমূহ: যেমন- অবাধ্যতা, সীমা লঙ্ঘন, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কষ্ট প্রদান, তাদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের উপর প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি। এর মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলী-আউলিয়ারা তাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে পরিশোধিত হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় আর শত্রুরা তাদের ধ্বংসের উপকরণ আরো বৃদ্ধি করে নেয়।

ত্রিশতম আসর: উম্মতের প্রতি নবীজীর দয়া ও সহানুভূতি (১)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের প্রতি ছিলেন খুবই দয়াবান। যখন তাঁকে দুটি বিষয়ের একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হত তখন তিনি সহজ বিষয়টি বেছে নিতেন। যাতে উম্মতের কষ্ট দূর হয় এবং তাদের জন্য বিষয়টি সহজ হয়।
এজন্যই তিনি বলেছেন:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتا وَلَا مُتَعَنِّتًا, وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا" [رواه مسلم]

নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে জোর প্রয়োগকারী ও কঠোরতাকারী হিসেবে প্রেরণ করেননি বরং তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন শিক্ষক ও সহজকারী হিসেবে।
তিনি আরো বলেন:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ, وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ" [رَواهُ أَبُوداودَ وصحَّحَه الألبانيُّ]

নিশ্চয় আল্লাহ দয়ালু, দয়া করা পছন্দ করেন, দয়ার কারণে সে পুরস্কার দান করেন করেন যা কঠোরতায় দান করেন না।
আরও ইরশাদ করেছেন,

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَمَا نُزِّعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانه" [رَواهُ مسْلِم]

কোমলতা যে বস্তুতেই পাওয়া যাবে সেটি তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে, আর যে বস্তু থেকে তা সরিয়ে নেওয়া হবে তা তাকে অসুন্দর করে দেবে।
আল্লাহ তাআলা তার নবী দয়া এবং নমনীয়তার গুণে গুণান্বিত মর্মে প্রশংসা করে বলেন:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।

উম্মতের প্রতি তার দয়ার দৃষ্টান,

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল: হে রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি।
রাসূলুল্লাহ বললেন: তোমাকে কীসে ধ্বংস করেছে?
সে বলল: আমি রমযানের দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি একজন গোলাম আযাদ করতে পার?
সে বলল: না।
তারপর বললেন: তাহলে তুমি কি দুই মাস লাগাতার রোযা রাখার সামর্থ্য রাখ?
সে বলল: না।

রাসূলুল্লাহ বললেন: তাহলে কি তুমি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে পারবে?
বলল: না।
লোকটি অপেক্ষা করছিল, এরই মাঝে একটি খেজুর ভর্তি থলে রাসূলের সম্মুখে আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি এগুলো সদকা করে দাও।
লোকটি বলল: আমার থেকে বড় অভাবী কে? মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এমন কোন পরিবার পাবেন না যারা আমার চেয়ে দরিদ্র। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর গজদন্ত বের হয়ে পড়ল। এরপর তিনি বললেন, তুমি এগুলো নিয়ে যাও এবং নিজ পরিবারকে প্রদান কর।
সম্মানিত পাঠক, যে লোকটি রমযানের দিনে ভুল করল এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করল তার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতো মমত্ব ও দয়াপূর্ণ আচরণ তা একটু ভেবে দেখলেই বুঝা যায়।
রাসূল সা: বার বার তার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করছিলেন এবং কঠিন শাস্তি থেকে তুলনামূলক সহজ শাস্তির দিকে নিয়ে এসেছেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, তিনি তাকে অপরাধ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তিপণ আদায়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।
বরং তার দারিদ্র্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি খাবার নিয়ে তার পরিবারস্থ লোকদের মাঝে বণ্টন করার অনুমতিও প্রদান করেছেন। কি অভূতপূর্ব মায়া ও নম্রতা । কেমন হৃদয় নাড়া দেয়া কোমলতা। এ হল নববী দয়া আর এমনই ছিল মুহাম্মদী হৃদ্যতা।
মুয়াবিয়া বিন হাকাম আস্সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম, হঠাৎ, সালাতে এক লোক হাঁচি দিল, তার উত্তরে আমি বললাম, يرحمك الله অর্থাৎ আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন ! এ শুনে সবাই আমার দিকে কড়াভাবে তাকাল, আমি তাদেরকে বললাম, হায় দুর্ভোগ ! তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন? তারা তাদের হাত দিয়ে উরুতে আঘাত করতে লাগল, আমি বুঝতে পারলাম তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। তাই আমি নীরব হয়ে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করে বলেন, -তাঁর জন্য আমার মাতা পিতা উৎসর্গ হোক, তাঁর পূর্বে আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষক এত সুন্দরভাবে শিক্ষা প্রদান করতে দেখিনি। আল্লাহর কসম তিনি আমাকে কোন প্রকার গালমন্দ করেননি, কোন রূপ তিরস্কার করেননি এবং কোন প্রকার মারধর করেননি- নিশ্চয় সালাতে মানুষের নিজেদের কোন কথা বলার অবকাশ নেই বরং সালাত হলো তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তিলাওয়াত।
ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীস আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়।
-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র, যার উপর তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন।
- জাহেল মূর্খদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ এবং তাদের প্রতি তাঁর দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন।
-এবং জাহেল-মূর্খদের সাথে হৃদ্যতা ও দয়াপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন, তাদেরকে কোন বিষয় শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন বা উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান, তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন এবং সঠিক বিষয়টি তাদের বোধ ও বুঝের নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর চরিত্রে নিজেদের চরিত্রবান করার ব্রত গ্রহণ করা।
উম্মতের প্রতি তাঁর সহানুভূতির আরো একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সওমে বিসাল তথা ইফতার ও সাহরী বিহীন লাগাতার রোযা রাখার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।
সহানুভূতির আরো একটি নিদর্শন:

তিনি রমযানে তিন বা ততোধিক রাত্র মসজিদে কিয়ামুল্লাইল করেছিলেন, এক পর্যায়ে তাঁর পেছনে বহু লোক সমবেত হয়ে গেলো, আর তিনি আশঙ্কা করলেন এভাবে চলতে থাকলে হয়ত সেটি তাদের উপর ফরয হয়ে যাবে। তাই তিনি আর সেখানে উপস্থিত হননি।
উম্মতের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির আরো একটি উদাহরণ:
তিনি একদিন মসজিদে গিয়ে মসজিদের দুই খুঁটিতে রশি বাঁধা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন: এ রশি কেন? লোকেরা বলল: এটি যয়নবের রশি। (ইবাদত করতে করতে) ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি এতে ঝুলে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, রশিটি খুলে ফেল, তোমাদের কেউ সালাত আদায় করলে যেন উদ্যম ও প্রাণবন- অবস্থায় আদায় করে। যদি ক্লান্ত ও অবসাদ গ্রস্ত হয়ে যায় তাহলে যেন বসে পড়ে।

একত্রিশতম আসর: উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহর দয়া ও সহানুভূতি (২)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَينَما نَحْنُ فِي المسْجِد مع رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاء أعرابِيٌّ فَقَام يبُولُ فِي المسْجِد، فَقَال أصحابُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :مَهْ مَهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" دَعُوهُ لَا تُزْرِمُوهُ()" فَتركُوه حَتَّى بال. ثُمَّ إِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هذهِ المسَاجِدَ لَا تصلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَالْقَذَرِ، إِنَّما هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ". قَالَ: فأمرَ رَجُلاً مِنَ القَوْمِ, فَجَاءَ بِدلوٍ مِنْ مَاءٍ فشنَّه عَليه. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.]

বিশিষ্ট সাহাবী আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে ছিলাম। একজন বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করল। এবং কিছু সময় পর মসজিদেই প্রস্রাব করতে উদ্যত হল। এ অবস্থা দেখে সাহাবারা তাকে বললেন: থাম... থাম...।
পরিস্থিতি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, প্রস্রাব বন্ধ করতে বাধ্য করো না। (এতে তার ক্ষতির আশঙ্কা আছে)
তারা তাকে ছেড়ে দিল, সে প্রস্রাব করল।
অত:পর রাসূলুল্লাহ তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন : এ মসজিদগুলোতে প্রস্রাব পায়খানা ও এ ধরনের কদর্য কাজ করা শোভনীয় নয় বরং এগুলো নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহর যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে।
বর্ণনাকারী বলছেন: এরপর নবীজী তাদের একজনকে (পরিষ্কার করার) নির্দেশ দিলেন, তিনি পানি ভর্তি একটি বালতি এনে তাতে ঢেলে দিলো।
উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহর কি মায়া-মুহব্বত ছিল এবং তিনি তাদের প্রতি কোন পর্যায়ের সহানুভূতিশীল ছিলেন, নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে আমরা এর একটি বাস্তব নিদর্শন দেখতে পাব।
জনৈক যুবক রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন!!
উপস্থিত লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমকাতে লাগল, এবং বলল: থাম... থাম...।
তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : নিকটে আস। সে তাঁর নিকটে আসল।
নবীজী বললেন : তুমি কি এ কাজ তোমার মায়ের জন্যে পছন্দ কর?
সে বলল : না আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার উপর উৎসর্গিত করুন।

নবীজী বললেন : কোন মানুষই তা নিজ মায়ের জন্যে পছন্দ করে না। আচ্ছা, তুমি কি এটি তোমার মেয়ের জন্য পছন্দ কর?

সে বলল: আল্লাহর কসম, না। ইয়া রাসূলুল্লাহ । আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন।

নবীজী বললেন, কোনো লোকই নিজ কন্যার জন্যে তা পছন্দ করে না। আচ্ছা তুমি কি তা তোমার বোনের জন্যে পছন্দ কর?

লোকটি বলল: আল্লাহর শপথ, না। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন।

নবীজী বললেন : লোকেরাও নিজ বোনদের জন্যে তা পছন্দ করে না। তুমি কি এটি তোমার ফুফুর জন্যে পছন্দ কর ?

সে বলল : না... আল্লাহর শপথ। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন।

নবীজী বললেন : লোকেরাও তাদের ফুফুদের জন্যে তা পছন্দ করে না। তুমি কি সেটি তোমার খালার জন্যে পছন্দ কর?

সে বলল: না... আল্লাহর শপথ। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন।

নবীজী বললেন : লোকেরাও নিজেদের খালার জন্যে তা পছন্দ করে না। অত:পর নবীজী নিজ হাত তার উপর রাখলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দাও। তার অন্তর পবিত্র করে দাও। তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত কর। এরপর থেকে যুবকটি আর কোন বস্তুর দিকে নজর দেয়নি।

এরূপ সহানুভূতিশীল ও হৃদ্যতাপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ যুবকটির হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন এবং তার প্রার্থিত বস্তু যিনাকে তার কাছে ঘৃণিত করে দিতে পারলেন এবং এটি পরবর্তীতে তার সংশোধন ও সরল-সঠিক পথে চলার দিশা হয়ে থাকল।

উম্মতের প্রতি তাঁর সদয় হওয়ার আরো একটি দৃষ্টান- :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: : بيْنَما النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ، إِذَا هُو برجُلٍ قائمٍ، فَسأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يقومَ فِي الشمْسِ وَلَا يقعدَ، وَلَا يستظلَّ ولا يتكلمَ, وَيصُومَ, فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم" :مُرُوه فَلْيَتَكَلَّمْ, وَلْيَسْتَظِلَّ, وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ" [رواهُ البخَارِيُّ.]

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা তার পরিচয় দিয়ে বলল: সে আবু ইসরাঈল, মান্নত করেছে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না এবং ছায়াতেও যাবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন: তাকে আদেশ কর সে যেন কথা বলে, ছায়ায় যায়, বসে এবং নিজ সওম পূর্ণ করে।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أُخْبِر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أقولُ: واللهِ لَأصومَنَّ النَّهارَ، ولَأقومنَّ الليلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : "أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟ "فقلْتُ له: قد قلتُه بِأَبِي أنتَ وَأُمِّي يَا رسولَ اللهِ. قَال: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ

ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ, وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, فَإِنَّ الحسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, وَذَلِك مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ."

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেয়া হল যে, আমি শপথ করেছি, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দিনভর রোযা রাখব আর রাতভর জাগ্রত থেকে এবাদতে কাটিয়ে দেব। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি সেরকম বলেছ?

আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার প্রতি আমার মাতা পিতা কোরবান হোক! হ্যাঁ আমি সেরূপ বলেছি। তিনি বললেন: তুমিতো তা পারবে না। বরং তুমি একদিন রোযা রাখ আর একদিন রোযাবিহীন থাক। রাতের কিছু সময় এবাদতে অতিবাহিত কর আর কিছু সময় ঘুমিয়ে কাটাও। আর প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোযা রাখ। কারণ প্রতিটি নেক কাজে দশগুণ করে ছাওয়াব দেয়া হয়। আর এটি হচ্ছে সিয়ামুদ্দাহারের দৃষ্টান্ত।

অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে :

(রাসূলুল্লাহ বললেন) আমি কি এ বিষয়ে সংবাদ প্রাপ্ত হইনি যে তুমি সারাদিন রোযা রেখে কাটাবে আর রাতভর এবাদতে মগ্ন থাকবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

নবীজী বললেন: তুমি এরূপ করবে না। বরং রোযা রাখবে এবং রোযাবিহীন থাকবে, রাতে (কিছু সময়) জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে এবং সাথে সাথে নিদ্রাও যাপন করবে। কেননা, তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখের হক আছে, তোমার স্ত্রীর হক আছে এবং তোমার প্রতিবেশীর হক আছে। তোমার জন্যে প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখাই যথেষ্ট। কারণ, তোমাকে একেকটি নেকীর পরিবর্তে (অনুরূপ) দশটি (নেকীর) ছাওয়াব দেয়া হবে। আর এটি হচ্ছে সিয়ামুদদাহার।

আব্দুল্লাহ বলেন : আমি আরো কঠিন দিক বেছে নিয়েছি। ফলে আমার উপর কঠিন করা হয়েছে। আমি বলেছি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশি শক্তি রাখি। রাসূলুল্লাহ বললেন : তুমি আল্লাহর নবী দাউদের অনুরূপ রোযা রাখ। এর অতিরিক্ত করো না। আমি বললাম : সিয়ামে দাউদের স্বরূপ কি? বললেন: অর্ধ দাহর। আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হওয়ার পর বলতেন : আমি যদি আল্লাহর রুখসতকে গ্রহণ করতাম কতই না ভাল ছিল।

বত্রিশতম আসর: আহযাব যুদ্ধ

বিশুদ্ধ মতানুসারে পরিখার যুদ্ধ নামে পরিচিত আহযাব যুদ্ধ, হিজরী পঞ্চম বছরের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে বলা হয়, হিজরী চতুর্থ বছরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে বনী নযীরের ইহুদীদের মদীনা থেকে দেশান্তরিত করে দেন। তখন তাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক মক্কায় গিয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে কুরাইশদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে জড় করতে থাকে এবং যুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্ররোচণার এক পর্যায়ে কুরাইশরা তাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছে। এরপর তারা গাতফান ও বনী সুলাইমের নিকট যায়, তারাও তাদের ডাকে সাড়া দেয়। এক এক করে আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট গিয়ে নবীজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকে।

অবশেষে কুরাইশরা আবু সুফয়ানের নেতৃত্বে বের হয়। যোদ্ধা সংখ্যা ছিল চার হাজার। সাথে ছিল তিন শত ঘোড়া ও এক হাজার পাঁচ শত উট।
মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে বনু সুলাইম থেকে সাত শত লোকের একটি বিশাল কাফেলা তাদের সাথে মিলিত হয়। তাদের দেখাদেখি আসাদ গোত্রের লোকেরাও বের হয়ে আসে। ফাযারাহ্ গোত্র থেকে এক হাজার, আশজা গোত্র থেকে চার শত, ও বনু মুররাহ থেকে আরো চার শত লোক তাদের সাথে যোগ দেয়। পরিশেষে বিভিন্ন গোত্র থেকে মোট দশ হাজার লোকের এক বশাল দল পরিখার দ্বার প্রান্তে এসে একত্রিত হয়। আর এরাই হল আহ্যাব তথা বিভিন্ন দল।
রাসূলুল্লাহর নিকট তাদের জড় হবার সংবাদ পৌঁছলে তিনি মদীনাবাসীকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করলেন। সালমান ফার্সী রা. পরিখা খনন করার পরামর্শ দিলেন। যার মাধ্যমে শত্রু বাহিনী ও মদীনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরামর্শ মোতাবেক পরিখা খনন করার আদেশ দিলেন। মুসলমানরা বিলম্ব না করে খনন কাজ শুরু করে দিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও খননে অংশ নিলেন। পরিখা সালআ পাহাড়ের সামনের দিকে খনন করা হয়েছিল। এমনভাবে যে, পাহাড়টি ছিল মুসলমানদের পেছনে আর পরিখাটি তাদের ও কাফিরদের সামনে।
ছয় দিনে খনন কাজ শেষ হল। অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার মুসলমানের বিশাল কাফেলা নিয়ে পেছনের পাহাড় ও সামনের পরিখার মাধ্যমে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন।
নবীজী মহিলা ও শিশু বাচ্চাদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার নির্দেশ করলেন। সে মতে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হল।
হুয়াই বিন আখতাব বনী কুরাইযার নিকট গেল, তাদের সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধি ছিল। এই দুষ্ট লোকটি তাদেরকে সন্ধি ভাঙ্গতে প্ররোচিত করতে থাকল। এক পর্যায় তারা সন্ধি ভঙ্গ করে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কাফিরদের সাথে মিলে গেল। যার কারণে মুসলমানদের বিপদ আরো বেড়ে গেল। এবং তাদের নিফাকি প্রকাশ পেয়ে গেল। এ দিকে বনী হারেসার কিছু লোক মদীনায় ফিরে যেতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়ে বলল :

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا .

আমাদের ঘর-বাড়ি খালি। অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।
বনী সালামাও পলায়নের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা উভয় দলকেই দৃঢ়তা দান করেন।
বারা বিন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদেরকে পরিখা খনন করার নির্দেশ দিলেন, একটি গর্তে প্রকাণ্ড ও শক্তি এক পাথর আমরা দেখতে পেলাম। অনেকগুলো কুড়ালও তাকে কিছু করতে পারছিল না। তখন আমরা নবীজীকে বিষয়টি জানালাম। নবীজী আসলেন এবং পাথরটি দেখে তাঁর কাপড় পাথরের উপর রাখলেন। এরপর কুড়াল নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে পাথরে একটি আঘাত করে এক তৃতীয়াংশ ভেঙে ফেললেন আর বললেন, আল্লাহু আকবার, আমাকে শামের চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমি এ মুহূর্তে শামের লাল অট্টালিকা গুলো দেখতে পাচ্ছি।
এরপর দ্বিতীয় আঘাত করলেন এবং আরেক তৃতীয়াংশ ভেঙে ফেললেন। আর বললেন, আল্লাহু আকবার, আমাকে পারস্যের চাবিগুলো দেয়া হয়েছে, আল্লাহর শপথ নিশ্চয় আমি মাদায়েনের সাদা অট্টালিকাগুলো দেখতে পাচ্ছি। অত:পর তৃতীয় আঘাত করলেন, এবং বললেন, বিসমিল্লাহ, ফলে পাথরের অবশিষ্ট অংশটিও ভেঙে গেল। এরপর বললেন, আল্লাহু আকবার, আমাকে

ইয়েমেনের চাবিগুলো দেয়া হয়েছে, আল্লাহর শপথ, আমি এ মুহূর্তে এখান থেকে সানআর ফটকগুলো দেখতে পাচ্ছি।
মুশরিকরা রাসূলুল্লাহকে এক মাস পযর্ন্ত অবরোধ করে রেখেছিল, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের ও মুসলমানদের মাঝে পরিখার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়ার কারণে কোন যুদ্ধ-লড়াই হয়নি ।
ইতিহাসবেত্তারা বলেন : খন্দকের দিন ভীতি খুব মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল, লোকজন ভীত হয়ে পড়েছিল, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের উপর আশঙ্কা হচ্ছিল। আর মুশরিকরা তাদের ঘোড়া প্রবেশ করানোর জন্যে গিরিপথ খুঁজছিল। বরং তাদের একটি দল পরিখা পাড়িও দিয়ে দিয়েছিল। তাদের মাঝে আমর বিন ওদ্দ- নামক ব্যক্তিও ছিল। সে এসে মল্লযুদ্ধের জন্যে ডাকাডাকি করতে লাগল। তার বয়স ছিল সত্তর বছর। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুকাবিলা করলেন এবং পরাভূত করে হত্যা করলেন।
সকাল হল, মুসলমানগণ একটি বিশাল ব্যাটেলিয়ন প্রস্তুত করলেন যাদের মাঝে খালেদ বিন ওলীদও ছিলেন, তারা রাত অবধি যুদ্ধ করলেন। এদিকে নবীজী যোহর ও আসর সালাত আদায় করতে পারেননি। তিনি বললেন, তারা আমাদেরকে আসর সালাত হতে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের ঘর ও কবরগুলো আগুন দ্বারা ভর্তি করে দেবেন।
অত:পর আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে একটি কাজের মাধ্যমে শত্রুদের অপমানিত করলেন এবং তাদের সংঘবদ্ধতাকে বিক্ষিপ্ত করে দিলেন। এটি এভাবে সম্ভব হয়েছে যে, নুয়াইম ইবনে মাসউদ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকদের কেউ বিষয়টি জানতে পারেনি। তিনি তাদের এ অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের মাঝে ঢুকে গেলেন, এবং কুরাইশ ও কুরাইযার মাঝে ভয় সৃষ্টি করে দিলেন।
অত:পর প্রচণ্ড বাতাস বইতে লাগল। আবু সুফিয়ান তার সাথিদের বলল, তোমরা নিজ দেশে নেই, উটের পায়ের তলা ও ক্ষুর ধ্বংস হতে চলেছে, কুরাইযা বিরোধিতা করছে, এবং কেমন বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাতো দেখতেই পাচ্ছ। চল ফিরে যাই, আমি চললাম।
সেই যুদ্ধে মুশরিকদের তিনজন এবং মুসলমানদের ছয় জন নিহত হয়েছে।

তেত্রিশতম আসর: নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায়পরায়ণতা
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ন্যায় পরায়ণতা নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ন্যায় পরায়ণতা, ইহসান ও আত্মীয়দের দান করতে আদেশ করেছেন।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়পরায়ণতা কর, এটাই তাকওয়ার সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সার্বজনীন ন্যায়বিচারের একটি দৃষ্টান্ত,
মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত নারী চুরি করল, বিষয়টি কুরাইশদের ভাবিয়ে তুলল। তারা শাস্তি মওকুফ করার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুপারিশ করত চাইল। নিজেরা বলাবলি করল, এ বিষয়ে রাসূলের সাথে কথা বলবে কে? তারাই বলল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়ভাজন উসামা বিন যায়েদই একমাত্র এই দুঃসাহস করতে পারে। অতঃপর উসামাহ বিন যায়েদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তার ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। অনুরোধ শুনে রাসূলুল্লাহর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছ? উসামা বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

সন্ধ্যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি আল্লাহর তাআলার প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা একারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর নির্বারিত দণ্ড আরোপ করত। আমি ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার আত্মা, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দেব।

এই হচ্ছে নববী ন্যায় বিচার, যা শক্তিশালী ও দুর্বলের মাঝে কোন পার্থক্য করে না, পার্থক্য করে না ধনী-গরিব ও রাজা-প্রজার মাঝে। সত্য ও ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে সকলেই এক সমান।

আরেকটি দৃষ্টান্ত,

সাহাবী নুমান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। তখন তার মাতা উমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যক্ষ করা অবধি আমি এতে রাজি নই। অতঃপর সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলল : আমি ওমরাহ বিনতে রাওয়াহার সম্পদ হতে আমার ছেলেকে কিছু দান করেছি। সে আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য আমাকে আদেশ করেছে,

রাসূলুল্লাহ বললেন : তুমি কি তোমার সব ছেলেকে এভাবে দিয়েছ। সে বলল, না। তখন তিনি বললেন: আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের ছেলেদের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বিতরণ কর। এরপর বশীর ফিরে গেল এবং তার দান ফিরিয়ে নিল।

আরেকটি বর্ণনায় আছে,

তিনি বললেন : তোমার কি এ ছাড়া আরো সন্তান আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন: তুমি এরকম করে সবাইকে দিয়েছ কি? বলল : না। তখন তিনি বললেন : তাহলে আমি অন্যায়-অবিচারের উপর সাক্ষ্য দেব না।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালামাল বিলি বণ্টন করছিলেন। এমন সময় যুল খুওয়াইসারা তামীমী আসল, এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! ন্যায়সংগতভাবে ভাগ করুন। রাসূলুল্লাহ বললেন : তোমার ধ্বংস হোক। আমি ন্যায়বিচার না করলে ন্যায়বিচার করবে কে? ন্যায় বিচার না করলে আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হব।

ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদা দান করেছেন, ন্যায় বিচারক বানিয়েছেন ও ওহীর আমানতও দান করেছেন, তিনি কীভাবে ন্যায়বিচার না করে পারেন? তিনিই তো এ বক্তব্য প্রদান করেছেন: নিশ্চয় ন্যায়বিচারকারীগণ আল্লাহ তাআলার নিকট নূর দ্বারা নির্মিত আসনে সমাসীন থাকবে। যারা নিজেদের বিচার-ফায়সালা, পরিবার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখত।

আর স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়বিচারের বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতেই হয় যে, এখানেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রি যাপন, সাংসারিক খরচপাতিসহ সবকিছুতে সফর-একামত সর্বাবস্থায় যতটুকু সম্ভব সমভাগ নিশ্চিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেকের নিকট এক রাত্র করে অবস্থান করতেন। নিজের হাতে যা থাকত তা তাদের প্রত্যেকের উপর সমভাবে খরচ করতেন। প্রত্যেকের জন্য একটি করে

কামরা নির্মাণ করেছেন। যখন ভ্রমণে যেতেন তখন তাদের মধ্যে লটারি দিতেন। যার অনুকূলে লটারি আসত তাকে নিয়ে বের হতেন। এ ব্যাপারে তিনি শিথিলতা করতেন না। এ সমতা ছিল তার আমরণ। তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাদের পালা অনুসারে প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হত। যখন এটি তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়ল, আর সকলে বুঝে নিল যে, তিনি আয়েশার ঘরে থাকতে চান, তখন সকলে আয়েশার ঘরে থাকার অনুমতি দিল। তিনি সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করলেন। এত সূক্ষ্মভাবে ন্যায্যতা রক্ষা করার পরও আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে বলছেন:

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك.

হে আল্লাহ আমি যার সামর্থ রাখি এটি আমার বণ্টন। অতএব তুমি যার মালিক এবং যা আমার আয়ত্বে নেই সে বিষয়ে তুমি আমাকে তিরস্কার কর না।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্ত্রীর দিকে অন্য স্ত্রীর তুলনায় বেশি ঝুঁকে যেতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন- যার দুজন স্ত্রী রয়েছে আর সে তাদের একজনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে গেল সে কিয়ামতের দিন এক পাশে নুয়ে থাকা অবস্থায় আসবে।

চৌত্রিশতম আসর: ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থান

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে সেখানকার ইহুদীদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি করে করেছিলেন। যে, কেউ কারো উপর আক্রমণ করবে না, জুলুম করবে না। কিন্তু তারা অতি দ্রুতই সে চুক্তি ভঙ্গ করল। এবং তাদের পূর্ব খ্যাতি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে দিল।

বনী কায়নুকার ইহুদীদের একটি ষড়যন্ত্রের উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নিয়ে বদর যুদ্ধে ব্যস্ত। এ সুযোগে তাদের এক লম্পট জনৈকা মুসলিম নারীকে উত্যক্ত করল। বাজারে মানুষের সামনে তার কাপড় খুলে ফেলল। মহিলা চিৎকার করে উঠলেন। একজন মুসলমান তার সাহায্যে ছুটে এসে ইহুদীকে হত্যা করলেন। এরপর সকল ইহুদী মিলে তাকেও হত্যা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর থেকে ফিরে এসে তাদের ডাকলেন এবং সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতি উত্তরে তারা খুব কড়া ভাষা ব্যবহার করল। বাড়াবাড়ির এক পর্যায়ে চুক্তি পত্রটি ফেরত পাঠাল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘেরাও করলেন। যখন তারা দেখল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরজি পেশ করে বলল: আমাদের ছেড়ে দিন। বিনিময়ে আমাদের সকল সম্পদ আপনাকে দিয়ে দেব। আর আমরা স্ত্রী সন্তানাদি নিয়ে এখান থেকে চলে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাদেরকে মদীনা হতে তাড়িয়ে দিলেন। মুসলমানরা তাদের দুর্গ হতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও সম্পদ সংগ্রহ করল।

ইহুদী বনী নযীরও সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। হিজরতের চতুর্থ বছর একটি দিয়ত তথা রক্ত বিনিময় ব্যাপারে সাহায্যের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নযীর গোত্রে গমন করেন। তিনি সেখানে গিয়ে একটি দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসলেন, আর এ সুযোগে তারা তাঁকে হত্যা

করার পরিকল্পনা করল। এভাবে যে, আমর বিন জাহ্‌হাশ একটি চাক্কি নিয়ে দেয়ালের উপর উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছেড়ে দেবে।
এ দিকে আকাশ হতে আল্লাহর দূত এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত সরে পড়লেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ খায়বারে নির্বাসনে পাঠান। ছয় শত উট বোঝাই করে তারা অর্থ-সম্পদ নিয়ে যায় এবং নিজেদের ঘর বাড়ি নিজ হাতে ধ্বংস করে খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।
আর ইহুদী বনী কুরাইযা! পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে তারাও চুক্তি ভংগ করেছিল। খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে যুক্ত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করেছিল। আল্লাহ মুশরিকদের অপমানিত করলেন, এবং তাদের ঐক্য ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন। অবশেষে তারা ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার সৈন্য নিয়ে বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে অভিযানে বের হলেন এবং অবরুদ্ধ করে সংকীর্ণ করে দিলেন তাদের জীবন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রস্তাব পাঠাল যে, আমরা সাদ বিন মুয়াযের ফায়সালায় সম্মত আছি। সাদ বিন মুয়ায রা. ফয়সালা করলেন : যুদ্ধের ক্ষমতা সম্পন্ন পুরুষদের হত্যা করা হবে, নারী ও বাচ্চাদের গ্রেফতার করা হবে এবং তাদের সম্পদ বণ্টন করে দেয়া হবে। সে হিসেবে পুরুষদের হত্যা করা হয়েছে। তবে কতিপয় লোককে এ রায়ের বাহিরে রাখা হয়েছে।
এ রায়টি মূলত: তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছিল। কারণ, তারা প্রার্থনা করেছিল যেন সাদ বিন মুয়ায তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করেন। তাদের ধারণা ছিল, আউসের সাথে সম্পর্কের কারণে হয়তো সাদ তাদের প্রতি কিছুটা দয়াশীল হবেন।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় : ইহুদীরা তাদের বন্দীদের সাথে এর চেয়েও নির্মম ব্যবহার করেছে। তাওরাতের এক জায়গায় আছে, বনী ইসরাঈল মাদায়েন সম্প্রদায়ের নারী ও বাচ্চাদের বন্দী করে, তাদের জীবজন্তু ও সম্পদ লুটে নেয়। তাদের ঘর বাড়ি ও দুর্গগুলো আগুন দ্বারা পুড়িয়ে দেয়। মূসা আ. রাগান্বিত হয়ে বলেন : তোমরা কি নারীদের জীবিত রেখেছো? এখন শিশুদের ভিতর যারা ছেলে তাদের নির্মূল করে ফেল। এবং যে সকল নারী সহবাস সম্পর্কে ধারণা রাখে তাদেরকে হত্যা কর, আর যারা এখনও সে সম্বন্ধে জানে না তাদেরকে জীবিত রাখ তোমাদের জন্যে। মাআজাল্লাহ, (আল্লাহর পানাহ!) আল্লাহর নবী মুসা আ. সহবাস নির্মূল বিষয়ক এ ধরনের প্রকৃতি-বিরোধী সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। কিন্তু তারা এভাবেই তাওরাতকে বিকৃত করেছে। এটা নিজ বন্দীদের ব্যাপারে তাদেরই সিদ্ধান্ত।

পয়ত্রিশতম আসর: ইসলামে যুদ্ধকে বৈধ করা হল কেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে ইসলামে প্রবেশ করানোর জন্য সাথে তলোয়ার নিয়ে চলতেন না। বরং আল-কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এ নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.

দীনের ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।
অন্য জায়গায় বলেছেন :

তুমি কি মানুষদের বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয়ে যায়?
অন্যত্র বলেছেন :
তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।
কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অভ্যন্তরীণ কিংবা বহিরাগত আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় হাত গুটিয়ে বসে থাকবে ইসলাম, কোনো পদক্ষেপ নিবে না। বরং আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অনুমতি দিয়েছেন, তারা নিজেদের উপর যে কোনো হামলা প্রতিহত করবে এবং তাদের উপর আরোপিত যুলম-নির্যাতনের প্রতিশোধ নিবে, তবে এক্ষেত্রে কোন রূপ অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করা যাবে না।
আল্লাহ তাআলা বলেন : যে তোমাদের উপর অন্যায়ভাবে যুলম করবে, তোমরাও তার থেকে বদলা নাও, যে পরিমাণ সে তোমাদের উপর যুলম করেছে।
আল্লাহ আরো বলেছেন : যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর। তবে তোমরা সীমা ছাড়িয়ে যাবে না।
অন্যত্র বলেছেন : তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করো।
এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে যুদ্ধ বৈধ করার মূল দিক হল : আত্মরক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ প্রতিহত করা। মুসলিম জাতিকে শত্রুপক্ষের যুলম, নির্যাতন ও অত্যাচার হতে হেফাযত করা। আমরা ইসলামী যুদ্ধের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ সত্যটি ভালো করে বুঝতে পারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যখন মক্কার কুরাইশদের নির্যাতন-নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেল, এমনকি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত বাকি থাকল না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরুপায় হয়ে হিজরত করেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুলমের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই শুরু হয়েছে। তারা অন্যায়ভাবে মুসলমানদেরকে নিজ বাড়ি-ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছে। তাই হিজরতের পর আল্লাহ তাআলা মুসলমান মুহাজিরদেরকে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন : (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি যুলম করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদের অন্যায়ভাবে স্বীয় ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তাদের অপরাধ, তারা বলে : আমাদের রব আল্লাহ।
আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কুরাইশ ব্যতীত আরবের অন্য কারো সাথে যুদ্ধে জড়িত হননি।
যখন মক্কার কুরাইশদের সাথে আরবের অন্যান্য মুশরিকরাও শরিক হল এবং সকলে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল, তখন আল্লাহ তাআলা সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً.

আর তোমরা সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যেমন তারা সকলে মিলে তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে লড়াই করে।
তখন থেকেই আহলে কিতাব ছাড়া সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জেহাদের হুকুম নাযিল হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু না বলা অবধি, আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর যদি তারা এ বাক্য পড়ে নেয়, তাহলে স্বীয় রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে আল্লাহর বিধান অনুসারে কোনো কিছু জরুরি হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর।

যখন মুসলমানগণ ইহুদীদের পক্ষ হতে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ও সন্ধির ব্যাপারে খিয়ানত দেখতে পেলেন, যেমন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের সাহায্য করেছে তখন, আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে খিয়ানতের (বিশ্বাস ভঙ্গ) আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিকেও সমানভাবে তাদের সামনে নিক্ষেপ করবে (বাতিল করবে) নিশ্চয় আল্লাহ খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সত্য ধর্ম গ্রহণ না করবে কিংবা অবনত হয়ে জিযিয়া কর দিতে সম্মত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যাতে মুসলমানরা তাদের দিক হতে নিরাপদ হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে নাসারাদের বিরুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগ-বেড়ে যুদ্ধ শুরু করেননি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন : হোদায়বিয়ার সন্ধির আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। কায়সার, কিসরা, মুকাওকিস ও নাজ্জাশীসহ সিরিয়া ও প্রাচ্যের আরব বাদশাহদের সকলের নিকটই পত্র প্রেরণ করেন।

খ্রিস্টান ও অন্যান্য জাতি হতে অনেক ভাগ্যবান লোক ইসলামে দীক্ষিত হল। সিরিয়ায় নাসারারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় তাদের নেতৃবর্গের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় মুসলমানকে মাআন নামক স্থানে নিয়ে হত্যা করে।

সুতরাং খ্রিস্টানরাই প্রথমে মুসলমানদের উপর চড়াও হয়। এবং তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ কারীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দূতদের মানুষদেরকে আহ্বান করার জন্য পাঠিয়েছেন, যাতে তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কোন রূপ বল প্রয়োগের জন্য নয়। আর তারাও ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে একজন ব্যক্তিকেও বাধ্য করেননি।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধগুলো নিম্নের কয়েকটি ধারায় বিভক্ত ছিল :

১.মক্কার কুরাইশদের আক্রমকারী হিসাবে চিহ্নিত করণ। কেননা, তারাই সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপর সীমা লঙ্ঘন করে। ফলে মুসলমানদের জন্যও যুদ্ধ বৈধ ঘোষণা করা হয়।

২. মুসলমানগণ ইহুদীদের খিয়ানত ও মক্কার কাফিরদের সাথে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়।

৩. আরবের কোনো গোত্র মুসলমানদের উপর হামলা করলে কিংবা মক্কার কাফিরদের সাহায্য করলে, কেবল তখনই মুসলমানরা ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন।

৪.খ্রিস্টানসহ অন্যান্য কিতাবী সম্প্রদায়ের যারাই শত্রুতার সূচনা করেছে তাদের সাথেই যুদ্ধ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা জিযিয়া দিতে সম্মত হয়েছে।

৫.যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করবে, তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে ইসলামের বিধান মতে হলে ভিন্ন কথা। ইসলাম তার পূর্বের সব অপরাধ মুছে দেবে।

ছত্রিশতম আসর: হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরতের ষষ্ঠ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার জন্য সকল সহাবিদের প্রস্তুত হতে বললেন। তারা খুব দ্রুত প্রস্তুতি নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজার চার শত সাহাবিসহ রওয়ানা করলেন। সাথে ছিল মুসাফিরের ন্যায় সামান্য হাতিয়ার, অর্থাৎ কোষ বন্ধ তলোয়ার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথিরা হাদি

(উমরার পশু) সাথে নিয়ে নিয়েছিলেন। কুরাইশরা এ ব্যাপারে অবগত হলে, হারাম শরীফ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গতিরোধ করার জন্য বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। অতঃপর মক্কার নিকটবর্তী হলেন। রাসূলকে নিয়ে তাঁর উট বসে পড়ল। মুসলমানরা বলতে লাগলেন : কোসওয়া চলতে চাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কোসওয়া বসে পড়েনি, বরং তাকে আটকে রেখেছেন সে সত্তা যিনি হস্তী বাহিনীকে আটকে দিয়েছিলেন। আজকে তারা আমার কাছে যে চুক্তিই করতে চাইবে, আমি তাদের সে চুক্তিতেই সই করব, যদি তাতে বাইতুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা বিদ্যমান থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট হাঁকালেন. উট উঠে দাঁড়াল এবং হুদাইবিয়ার নিকট সামান্য পানি বিশিষ্ট একটি কূপের নিকট অবতরণ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তীর বের করে, তার ভেতর গেড়ে দিলেন, সাথে সাথে পানি বের হতে লাগল। সকলে কূপ থেকে হাতের আজলা ভরে পানি পান করলেন।

বুদাইল ফিরে গিয়ে কুরাইশদের সংবাদ দিলে তারা উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফীকে প্রেরণ করল। তার সাথেও বুদাইলের ন্যায় কথাবার্তা হল। সাহাবায়ে কেরাম তাকে এমন কিছু আচরণ দেখাল, যার দ্বারা সে বুঝতে পারে যে, মুসলমানগণ মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন মহব্বত করে এবং কীভাবে তার অনুসরণ ও আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছে। সে ফিরে গিয়ে মক্কার কাফিরদের এ সম্পর্কে বর্ণনা দিল। অতঃপর তারা কেনানা বংশের জনৈক হুলাইছ বিন আলকামাকে পাঠাল, তারপর মিকরাজ ইবনে হাফসকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কথা বলছিলেন। এমতাবস্থায় সুহাইল ইবনে আমর আসলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, তোমাদের জন্যে তোমাদের ব্যাপারটি সহজ করা হয়েছে।

অতঃপর দু পক্ষের মাঝে সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন হল। অথচ সেদিন যদি মুসলমানগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন তাহলে তারাই জয়ী হতেন। কিন্তু তারা বাইতুল্লাহর সম্মান যথাযথভাবে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

সন্ধি চুক্তি ছিল নিম্নরূপ :

১.উভয় পক্ষের মাঝে দশ বছর পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না।

২.এক পক্ষ অপর পক্ষকে নিরাপত্তা দেবে।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর ফিরে যাবেন, তবে শর্ত হচ্ছে, আগামী বছর তিনি ও মক্কার মাঝে তারা কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

৪.মুসলমানদের কাছে তাদের কেউ আসলে তারা তাকে ফিরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে, যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু তাদের কাছে কোনো মুসলমান ফিরে গেলে, তারা তাকে ফিরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে না।

৫.কুরাইশ ব্যতীত অন্য যে কেউ মুহাম্মদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইলে, হতে পারবে। তদ্রুপ মক্কার কুরাইশদের সাথে কেউ চুক্তিবদ্ধ হতে চাইলে, তারাও তা পারবে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলাফল:

সন্ধির সময় মুসলমানদের অনেকেই এ চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল, এ সন্ধিচুক্তি একপেশে এবং চুক্তির ধারাগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের উপর অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মুসলমানগণ এর উত্তম ফলাফল পেতে শুরু করেছিলেন। তা হতে নিম্নে কিছু প্রদান করা হল,

১.কুরাইশদের পক্ষ হতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। কারণ, দুপক্ষ এক সমান না হলে চুক্তি হয় না। এই স্বীকৃতির একটি বিরাট প্রভাব অন্যান্য গোত্রের মধ্যেও পড়েছে ।
২.মুশরিক ও মুনাফিকদের অন্তরে ভীতির সঞ্চারণ। তাদের অনেকেই ইসলামের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। মক্কার কতিপয় নেতৃবর্গের খুব দ্রুত ইসলাম গ্রহণের কারণে বিষয়টি তাদের নিকট আরো স্পষ্ট হয়। যেমন খালেদ বিন ওলীদ ও আমর ইবনুল আস রা.।
৩.যুদ্ধবিরতি ইসলামের প্রচার-প্রসার ও লোকদের এ সম্পর্কে অবহিত করার একটি বিরাট সুযোগ এনে দেয়, যা অনেক লোক ও গোত্রকে ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে।
৪.মুসলমানগণ কুরাইশদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল। ফলে ইহুদীসহ ইসলামের অন্যান্য শত্রুদের ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া সহজ হয়ে গেল। আর খায়বর যুদ্ধতো হুদায়বিয়ার সন্ধির পরই সংঘটিত হয়েছে।
৫.সন্ধির আলাপ-আলোচনা কুরাইশের অনেক মিত্রদেরকে মুসলমানদের সম্পর্কে জানার এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছে। উদাহরণত: হুলাইস বিন আলকামা যখন মুসলমানদের দেখল যে, তারা তালবিয়া পড়ছে, সে নিজ সাথীদের কাছে গিয়ে বলল: আমি তাদের অনেক হাদী দেখেছি, যাদের কালাদা পরানো হয়েছে এবং হজের আলামত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, তাদেরকে বাইতুল্লাহ থেকে ফেরানো যাবে না।
৬.হুদাইবিয়ার সন্ধি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুতার যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যা ছিল আরব উপদ্বীপের বাইরে অভিনব পন্থায় ইসলামের দাওয়াত কার্য পরিচালনার নতুন পদক্ষেপ।
৭.এই সন্ধি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোম, পারস্য ও কিবতী রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে চিঠি-পত্র পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করেছে।
৮.হুদাইবিয়ার এ সন্ধি ছিল মূলত: মক্কা বিজয়ের পট ভূমিকা ।

সাইত্রিশতম আসর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়াদা রক্ষা

ইসলাম ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ধর্ম, সন্ধি-চুক্তি, প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ধর্ম।
আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾(المائدة:)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ কর।
অন্যত্র বলেন :

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾(الإسراء৩৪)

আর তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।
আল্লাহ তাআলা অন্যত্র প্রশংসা করে বলেন :

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾(الرعد২০)

যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ؛ فَلَا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ" [رواه أبو داود والترمذي]

কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যাদের সন্ধি থাকে, সে ঐ সন্ধি ভঙ্গ করবে না এবং তাতে কড়াকড়িও করবে না, যতক্ষণ না তার সময় শেষ হয় কিংবা চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয়।
মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার মুসাইলামাতুল কায্যাবের দুজন দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা শেষে বললেন, যদি দূত হত্যা করা নিষিদ্ধ না হতো, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম। তখন থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ চালু হল, দূতদেরকে হত্যা করা যাবে না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাফিরদের সাথে ওয়াদা রক্ষার আরো একটি উদাহরণ হুদাইবিয়ার সন্ধিতে পরিদৃষ্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমরের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদন করছেন, যার মধ্যে একটি ধারা ছিল, কুরাইশদের কেউ এ চুক্তিকালীন সময়ে নবী মুহাম্মদের নিকট আসলে নবীজী তাকে ফেরত দিয়ে দেবেন যদিও সে মুসলমান হয়, বাকি ধারাগুলো লেখার কাজ এখনও চলছে, আবু জান্দাল ইবনে আমর বিন সুহাইল শৃঙ্খলিত পা ও হাতকড়ি পরিহিত অবস্থায় এসে উপস্থিত হল। সে মক্কার নিম্ন অঞ্চল দিয়ে এসে, মুসলমানদের কাছে নিজেকে হাজির করল।
সুহাইল বলল : মুহাম্মদ, এই যে আবু জান্দাল, সর্বপ্রথম তার ব্যাপারে চুক্তি রক্ষা করার দাবি জানাচ্ছি আমি। তাকে আমার কাছে ফেরত দাও।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমরাতো এখনও চুক্তি সম্পাদন শেষ করিনি।
সে বলল: তবে আমি তোমার সাথে আর কোনো ব্যাপারেই চুক্তি করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: শুধু তাকে আমার জন্য ছাড় দাও।
সে বলল: আমি তোমার জন্যও তাকে ছাড় দেব না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অবশ্যই তুমি তার ব্যাপারটি ছাড় দাও।
সে বলল: আমি ছাড় দিতে পারব না।
এ দিকে আবু জান্দাল খুব উচ্চ স্বরে চিৎকার করছিল, হে মুসলমান ভাইয়েরা! আমি কি মুশরিকদের নিকট প্রত্যর্পিত হব আর তারা আমাকে আমার দীনের ব্যাপারে কষ্ট দেবে? অথচ আমি মুসলমান হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : আবু জান্দাল! ধৈর্য ধারণ কর। উত্তম প্রতিদানের আশা রাখ। অবশ্যই আল্লাহ তোমার জন্য এবং তোমার সাথে থাকা সকল দুর্বল মুসলমানদের জন্য স্বস্তি ও মুক্তির পথ বের করে দেবেন। আমরা তাদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেছি। তারা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমরাও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখন আমরা তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারি না।
তদ্রুপ কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ সাকীফ গোত্রের জনৈক আবু বশীর রা. পলায়ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চলে আসেন। কুরাইশরা তার খোঁজে দুজন লোক পাঠায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধি মোতাবেক তাকে ফেরত দিয়েদেন। এসব ঘটনাপঞ্জিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধি ও অঙ্গীকারের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীলতার বিষয়টি প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যদিও সেসব অঙ্গীকার ও সন্ধিতে মুসলমানরা বাহ্যিকভাবে অন্যায়ের শিকার হয়েছে।
আরেকটি উদাহরণ :
বারা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওমরা করার ইচ্ছা করলেন, মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি চেয়ে দূত পাঠালেন। তারা শর্ত করল : তিন দিনের বেশি

থাকা যাবে না। তলোয়ার কোষবদ্ধ করা ব্যতীত প্রবেশ করা যাবে না। তাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া যাবে না।

তিনি বলেন, আলী ইবনে আবী তালিব শর্তগুলো লিখছিলেন। তিনি লিখলেন, এটি সেই চুক্তি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যার ফয়সালা দিয়েছেন। তারা সাথে সাথে বলে উঠল: আমরা যদি তোমাকে আল্লাহর রাসূল মনেই করতাম, তবে তো মক্কায় প্রবেশ করতে নিষেধ করতাম না, এবং অবশ্যই সকলে তোমার অনুসরণ করতাম। বরং এভাবে লিখ : এটা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর ফয়সালা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি যেমন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তদ্রুপ আল্লাহর রাসূলও। অত:পর আলী রা. কে বললেন : রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। আলী রা. বললেন : না, আমি মুছতে পারব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাকে দেখিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দিলে তিনি স্বহস্তে তা মুছে দিলেন। মক্কায় প্রবেশ করার পর যখন তিন দিন হয়ে গেল, তারা আলীর নিকট এসে বলল, তোমাদের সঙ্গীকে চলে যেতে বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেন : ঠিক আছে। অতঃপর রওয়ানা হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা মুতাবেক তিন দিনের বেশি অবস্থান করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা খেলাপি ও বিশ্বাসঘাতকতা হতে সতর্ক করে বলেন। যে ব্যক্তি কাউকে নিরাপত্তা দিয়ে হত্যা করবে, আমি সে হত্যাকারী হতে মুক্ত, যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : যে সম্প্রদায় চুক্তি ভঙ্গ করবে, তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ব্যাপকতা লাভ করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা রক্ষার পরিপন্থী বিষয় খিয়ানত হতে পানাহ চেয়েছেন। তিনি বলেন : আমি তোমার নিকট খিয়ানত হতে পানাহ চাচ্ছি। কারণ, এটা খুবই নিকৃষ্ট স্বভাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বাস ঘাতকতা ও খিয়ানতকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। বলেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাস ঘাতকের ওয়াদা খেলাপির জন্য ঝান্ডা থাকবে, যার মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে বলেছেন : আমি ওয়াদা ভঙ্গ করি না।

আটত্রিশতম আসর: মহা বিজয়ের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়

হোদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক খুযাআ গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধীনে আর বকর গোত্র কুরাইশদের অধীনে সন্ধি চুক্তির আওতাভুক্ত হল। এর পরের ঘটনা, খুযাআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, বকর গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে ধৃষ্টতাপূর্ণ কবিতা আবৃত করতে দেখল। তাই তাকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয়। এই কারণে উভয় গোত্রের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল এবং বনী বকর বনী খুযাআর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করল। বনী বকর তাদের মিত্র কুরাইশদের নিকট সাহায্য চাইলে তারা অস্ত্র এবং বাহন দিয়ে সহযোগিতা করল। কুরাইশদের অনেকে চুপিসারে যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করল। যেমন সফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরামা ইবনে আবু জাহাল এবং সুহাইল ইবনে আমর। বনী খোযাআ হারাম শরীফে আশ্রয় নিল কিন্তু বনী বকর হারামের সম্মান রক্ষা করেনি। তারা সেখানেই খুযাআর উপর হামলা চালায় এবং বিশ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করে।

এর মাধ্যমে কুরাইশরা তাদের ও রাসূলুল্লাহর মাঝে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করল। কারণ, তারা রাসূলের অধীনে চুক্তিতে আবদ্ধ বনী খোযাআর বিরুদ্ধে বনী বকরকে সাহায্য করেছে। তারা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আমার নিজেকে যেভাবে হেফাযত করি, তোমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই হেফাযত করব।

অতঃপর কুরাইশরা অনুশোচনা করল এবং আবু সুফিয়ানকে চুক্তি নবায়ণ এবং চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করার আবদার জানিয়ে পাঠাল। তাদের এ অনুশোচনা কোনো কাজে আসেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো উত্তর করেননি বরং উপেক্ষা করেছেন। তখন সে বড় বড় সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার মাঝে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানিয়ে তাদের সহযোগিতা চাইল, সকলেই তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে সে ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে এলো।

কুরাইশদের পক্ষ হতে মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় ও কাফিরদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার সংকল্প করলেন।

অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বিষয়টি গোপন রাখলেন। কারণ, তার পরিকল্পনা ছিল হঠাৎ করেই মক্কায় ঢুকে পড়ে কুরাইশদের নিজ ঘরের মধ্যেই আটকে ফেলবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আশপাশের আরব গোত্রের নিকট সংবাদ পাঠালেন। যেমন, আসলাম, গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা, আসজা ও সুলাইম। এক পর্যায়ে মুসলমানদের সংখ্যা দশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মদীনাতে আবু রুহ্ম আল-গিফারীকে প্রতিনিধি মনোনীত করে, রমজানের ১০ম তারিখ বুধবার দিন রওয়ানা করলেন। কাদীদ নামক স্থানে তিনি ঝান্ডা উত্তোলন করলেন।

রাসূলের এ অভিযানের সংবাদ তখনও মক্কায় পৌঁছেনি, তারা আবু সুফিয়ানকে সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রেরণ করল। তাকে তারা বলে দিল, যদি মুহাম্মাদের সাথে তোমার দেখা হয়, তবে তাঁর থেকে আমাদের জন্যে নিরাপত্তা নিয়ে নিও।

আবু সুফিয়ান, হাকিম বিন হিযাম এবং বুদাইল বিন ওরকা বের হল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহিনী দেখে ভয় পেয়ে গেল। এদিকে আব্বাস রা. আবু সুফিয়ানের আওয়াজ শুনে ফেললেন। তিনি বললেন : হে হানযালার বাপ! সে বলল : উপস্থিত, বলুন। তিনি বললেন : দেখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাথে দশ হাজার সৈন্য বাহিনী। তখন আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। আর আব্বাস রা. তাকে নিরাপত্তা দিলেন। আবু সুফিয়ান ও তার দুই সাথিকে নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রা.-কে বললেন: তুমি তাকে নিয়ে মুসলমানদের চলার পথে দাঁড় করিয়ে দাও, যাতে সে মুসলমানদের শক্তি ও ক্ষমতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে। আব্বাস রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশারায় বললেন, আবু সুফিয়ানকে কিছু একটা দিন যা দিয়ে সে গর্ব করতে পারে। কারণ, সে গৌরব প্রিয় লোক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে সে নিরাপদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে বললেন। তিনি সকল নেতৃবর্গকে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেছেন, তোমরা যুদ্ধ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। তবে যদি কেউ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় তাহলে শুধু তার সাথেই যুদ্ধ করবে। খালেদ বিন ওলীদ ব্যতীত মুসলমানদের কেউ কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। খানদামা নামক স্থানে কুরাইশদের একটি দলসহ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে আমর এবং ইকরামা বিন আবু জাহেলের সাথে খালেদ বিন ওলীদের সাক্ষাৎ হয়। তারা তাকে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। এবং অস্ত্র প্রদর্শন করে ও তীর নিক্ষেপ করে। খালেদ তার সাথিদের যুদ্ধের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। মুশরিকদের তেরো জন নিহত হল আর মুসলমানদের মাত্র দুজন শহীদ হলেন। তারা হলেন কারয বিন জাবের এবং হুবাইশ বিন খালেদ বিন রাবিআ।
জুহুন নামক স্থানে রাসূলের তাঁবু সাটানো হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলপ্রয়োগ করে বীর দর্পে মক্কাতে প্রবেশ করেন। ফলে মক্কাবাসী ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাকে মেনে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের উপর চড়ে বাইতুল্লার তাওয়াফ সম্পাদন করলেন। কাবার চার পাশে তিন শত ষাটটি মূর্তি রাখা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর পাশ দিয়ে যেতেন আর হাতে রাখা লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন। মুখে বলতেন:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ.

এবং সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে।
মূর্তিগুলো তখন উপুর হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সর্ববৃহৎ মূর্তিটির নাম ছিল হুবুল, এটা ছিল কাবার একেবারে সামনে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে এসে দুরাকাত সালাত আদায় করলেন। এর পরেই লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য আসলেন। বললেন : হে কুরাইশ জনগণ! তোমাদের কি ধারণা, আমি তোমাদের সাথে কি রূপ ব্যবহার করব? তারা বলল : আপনি ভাল ব্যবহারই করবেন। আপনি আমাদের উদার-অনুগ্রহশীল ভাই, এবং অনুগ্রহশীল ভাইয়ের ছেলে। তিনি বললেন : তোমরা যাও, তোমরা সকলেই মুক্ত ও স্বাধীন। আল্লাহ তাদের উপর বিজয়ী করে দেয়ার পর, তিনি তাদের ক্ষমা করে দিলেন। অপরাধী ও অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করার পর তিনি মাফ করে দেয়ার একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। অতঃপর সাফা পাহাড়ে বসলেন। সেখানে লোকজন তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করল। তাঁর কথা শুনবে এবং সাধ্য মত তাঁর অনুসরণ করবে মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করল। অত:পর একের পর এক লোক এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল।
মক্কা বিজয়ের দিনটি ছিল শুক্রবার, রমজান মাসের বিশ তারিখ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পনেরো দিন অবস্থান করেন। অতঃপর হুনাইন অভিমুখে যাত্রা করেন। মক্কাতে সালাত পড়ানোর জন্য ইতাব বিন উসাইদকে মনোনীত করলেন, আর দীনী শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মুয়ায বিন জাবালকে দায়িত্ব দিলেন।

উনচল্লিশতম আসর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষমা

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ .

আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত বলেই তুমি তাদের সাথে বিনয়ী ও নম্র হয়েছ। আর যদি তুমি কর্কশ ও কঠিন হৃদয়ের হতে, তারা তোমার নিকট হতে সরে যেত। তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এবং যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ কর।

অন্যত্র বলেন :

সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ স্বভাব ছিল, ক্ষমা করা এবং এড়িয়ে চলা, তবে যখন একেবারে জরুরি হয়ে পড়ত, তখন কেবল শাস্তি দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে ক্ষমার অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, একটি বড় নমুনা।

আরেকটি উদাহরণ:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদের এলাকায় একটি অশ্ববাহিনী প্রেরণ করেন। তারা বনী হানীফার এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসে। যার নাম সুমামা বিন উসাল, ইয়ামামা বাসীদের নেতা। তারা তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেধে রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট এসে বললেন : সুমামা! তোমার খবর কি-(তোমার কিছু বলার আছে কি)? সে বলল : ভাল, মুহাম্মদ। যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তবে রক্ত মাংসের একজন মানুষকে হত্যা করবে (হত্যাপোযুক্ত একজন ব্যক্তিকে হত্যা করবে), আর যদি আমাকে ক্ষমা কর, তবে কৃতজ্ঞ একজন ব্যক্তিকে ক্ষমা করবে। আর যদি সম্পদ চাও, তবে যা চাইবে, তাই দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই অবস্থায় রেখে চলে গেলেন। পরবর্তী দিন বললেন : সুমামা! খবর কি তোমার ? সে বলল : আমি আগে যা বলেছি তাই। যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তবে রক্ত মাংসের একজন লোককে হত্যা করবে, আর যদি ক্ষমা কর, তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই ক্ষমা করবে। আর যদি সম্পদ চাও, তবে যা চাইবে, তাই দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সে অবস্থায় রেখে ফিরে গেলেন। পরবর্তী দিন আবার বললেন : সুমামা! তোমার খবর কি ? সে বলল : গতকাল যা বলেছি তাই। আমাকে হত্যা করলে রক্ত মাংসের একজন মানুষকে হত্যা করবে, আর ক্ষমা করলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিতে ক্ষমা করবে। আর যদি সম্পদ চাও, তবে বল, যা চাইবে, তাই দেয়া হবে। তিনি বললেন : সুমামাকে ছেড়ে দাও। সে ছাড়া পেয়ে মসজিদের পাশে একটি বাগানে গিয়ে গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করল। অতঃপর বলল :

أَشْهدُ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وأَشْهدُ أَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه؛ يا محَمَّد! واللهِ مَا كانَ فِي الأَرْضِ وَجهٌ أبغضَ إِلَيَّ من وجْهِكَ، فَقَدْ أَصبَح وجهُك أحبَّ الوجُوهِ كُلِّها إليّ، واللهِ مَا كانَ مِن دِينٍ أبغضَ إِلَيَّ مِن دينِك, فأَصبحَ دينُك أحبَّ الدِّينِ كلِّه إليَّ. واللهِ ما كانَ مِن بلدٍ أبغضَ إليَّ مِنْ بَلَدِكَ, فأَصبَحَ

بلدُكَ أحبَّ البِلادِ كُلِّها إليَّ. وإنَّ خيلَك أخذَتْني وَأَنَا أُريدُ العُمْرَةَ, فَمَاذَا تَرى؟ فَبشَّره رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَمَره أنْ يعْتمِرَ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা এবং রাসূল। হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, পৃথিবীর বুকে আমার নিকট আপনার চেহারার চেয়ে অধিক ঘৃণিত কোনো চেহারা ছিল না। আর এখন আপনার চেহারা অন্য সকল চেহারা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার নিকট আপনার দীন অপেক্ষা ঘৃণিত আর কোনো দীন ছিল না আর এখন আপনার দীন অন্য সকল দীন থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার শহরই আমার নিকট ছিল সর্বাধিক ঘৃণিত শহর আর এখন সেটিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে।

আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে গ্রেফতার করেছে আর আমি উমরা পালনের মনস্থির করেছি। আপনি কি বলেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দান করলেন এবং উমরা পালনের নির্দেশ দিলেন।

তিনি মক্কায় আসলে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল: তুমি কি বেদীন হয়ে গিয়েছ? উত্তরে তিনি বললেন: না, বরং আমি রাসূলুল্লাহর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এখন থেকে রাসূলুল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত ইয়ামামাহ থেকে তোমাদের কাছে এক দানা গমও আর আসবে না।

সুপ্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করে দেখুন। ক্ষমা ও উদারতা মানুষকে কীভাবে পরিবর্তন করে দেয়। মানুষের অন্তরে কত সুন্দরভাবে এর প্রভাব পড়ে। এবং এ উদারতা কত নিপুণভাবে মানুষকে কুফরের অমানিশা ও শিরকের বিভ্রান্তি হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষমার আরেকটি নিদর্শন:

যে ইহুদি মহিলা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ প্রয়োগ করে বকরির গোস্ত পরিবেশন করেছিল তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানিক গোস্ত ভক্ষণ করেন। কিন্তু তিনি প্রতিশোধ নেননি। অবশ্য পরে তার গোস্ত খেয়ে মারা যাওয়া বিশ্‌র ইবনে বারা বিন মারূরের কিসাস স্বরূপ তাকে হত্যা করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষমার আরেকটি উদাহরণ : জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজ্‌দ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা শেষে ফিরতি পথে কাটাদার বৃক্ষ ভর্তি একটি ময়দানে বিশ্রাম নেয়ার জন্য যাত্রা বিরতি দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম ছায়ার তালাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামুরা নামক গাছের সাথে তলোয়ার ঝুলিয়ে তার নীচে বিশ্রাম নিতে লাগলেন।

জাবের রা. বলেন : আমরা সামান্য ঘুমিয়ে নিলাম। হঠাৎ দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডাকছেন। আমরা তার নিকট গেলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, একজন বেদুইন তার নিকট বসা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায়, আমার তলোয়ার নিয়ে নেয়। আমি জাগ্রত হয়ে দেখি, তার হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার। সে আমাকে বলল : তোমাকে আমার কবল হতে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এখানে বসা, এই সে ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দেন।

চল্লিশতম আসর: রহমতের নবী (৩)

শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ ও দয়া

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতি সকল মানুষ অপেক্ষা বেশি দয়াবান ও স্নেহবৎসল ছিলেন।

বিশিষ্ট সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লহু আনহুমাকে চুমু খেলেন, তখন তাঁর নিকট আকরা বিন হাবেস তামীমী রাদিয়াল্লাহু আনহু বসা ছিলেন। তিনি বললেন: আমার দশজন সন্তান আছে আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু খাইনি। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন। অত:পর বললেন: যে অপরের প্রতি দয়া করে না তাকেও দয়া করা হয় না

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু বেদুইন লোক আসল। তারা জিজ্ঞেস করল: তোমরা কি তোমাদের বাচ্চাদেরকে চুমু খাও? সাহাবারা বললেন: হ্যাঁ। তারা বলল: কিন্তু আমরা - আল্লাহর কসম- আমাদের বাচ্চাদের চুমু খাই না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ তাআলা যদি তোমাদের থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নেন তাহলে আমি কি কিছু করতে পারি?

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের শিশুদের প্রতি স্নেহ-মমতার বিশাল দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। সাথে সাথে এ বিষয়টি ও ফুটে উঠেছে যে, বাচ্চাদের চুমু খাওয়া স্নেহ-মমতার একটি নিদর্শন। তাঁর বাণী যে রহম করে না তাকেও রহম করা হয় না। এ কথার প্রমাণ বহন করে যে প্রত্যেক কাজের প্রতিদান সে কাজের অনুরূপ হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি শিশুদেরকে স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত করবে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করবেন।

শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ মমতার আরো একটি দৃষ্টান্ত : তিনি স্বীয় সন্তান ইবরাহীমের মৃত্যুর প্রাক্কালে তার নিকট আসলেন, রাসূলুল্লাহর চক্ষু দ্বয় অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। এবং বললেন: নিশ্চয় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয়-মন ব্যথিত ও পেরেশান হয় আর আমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন কোন কথা বলব না। বরং তাঁকে সন্তুষ্ট করে এমন কথাই বলব, আর আমরা হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে খুবই ব্যথিত।

এ ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তি কে সবরের সাথে প্রসন্ন চিত্তে মেনে নেয়ার মাধ্যমে তাঁর রবকে উবুদিয়্যতের পরিপূর্ণ হক প্রদান করলেন। আর সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন ও তার বিরহে অশ্রু বর্ষণ করার মাধ্যমে সন্তানের হক আদায় করেছেন। আর এটিই হচ্ছে উবুদিয়্যতের (দাসত্ব প্রকাশের) পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

আর যখন তাঁর মেয়ের ছেলে (নাতি) মারা গেল, তার চক্ষু থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। এ দৃশ্য দেখে সাহাবী সাদ বিন উবাদা আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ কি? তখন তিনি বললেন:

এটি হচ্ছে রহমত, (মায়া-মমতার নিদর্শন) আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে রেখে দিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যারা স্নেহ বৎসল ও রহমশীল শুধুমাত্র তাদেরকেই রহম করেন।

শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার আরো একটি দৃষ্টান্ত :

তিনি একবার একজন অসুস্থ ইহুদী কিশোরকে দেখতে গেলেন - বাচ্চাটি তাঁর সেবা করত- তিনি তাকে বললেন: তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বল। ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকাল: সে বলল: তুমি আবুল কাসেমের (রাসূলুল্লাহ) অনুসরণ কর (তার কথা মান্য কর)। এরপর ছেলেটি লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ বলল। রাসূলুল্লাহ বললেন: الحمد لله الذي أنقذه من النار সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি একে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেছেন।

আরো একটি দৃষ্টান্ত :

সাহাবি আনাস বিন মালেকের উমায়র নামক একটি গোলাম ছিল। তার একটি ছোট পাখি ছিল, তার সাথে সে খেলা করত। সে পাখিটি এক সময় মরে যায় ফলে ছেলেটি খুবই ব্যথিত হয়। রহমতের নবী তার এ দু:সময়ে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তার সাথে কৌতুক করে বললেন:

يا أبا عمير, ما فعل النغير .

হে আবু উমায়র, কি করেছে তোমার নুগায়র ?

আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব অথবা এশার কোন এক সালাতে হাসান রা. অথবা হোসাইন রা.কে বহন করা অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করলেন। অতঃপর তাকে রেখে রাসূলুল্লাহ ইমামতির জন্যে সামনে অগ্রসর হলেন, সালাতের তাকবীর বললেন এবং এরই মাঝে সিজদায় গিয়ে অনেক দীর্ঘ সময় কাটালেন, শাদ্দাদ তাঁর মাথা উত্তোলন করে দেখলেন ঐ শিশু বাচ্চাটি রাসূলুল্লাহর পিঠের উপর, তিনি সালাত শেষ করলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি সালাতে অনেক বড় সেজদা করলেন, আমরা মনে করেছি, কোন ঘটনা ঘটেছে অথবা আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে, তিনি বললেনঃ এসবের কোনটিই হয়নি। তবে আমার নাতি আমার পিঠে সাওয়ার হয়েছে, সে তার চাহিদা মিটানোর পূর্বেই তাড়াহুড়ো করে তাকে নামিয়ে দেয়া আমার কাছে ভাল মনে হয়নি।

শিশুদের প্রতি তাঁর দয়ার আরো একটি নমুনা:

তিনি আনসারদের যিয়ারত করতেন, এবং তাদের শিশুদের সালাম দিতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

ছোট ছোট বাচ্চাদের যে তিনি আদর করতেন তার আরো একটি উদাহরণ: তাঁর কাছে শিশুদের নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের কল্যাণের দুআ করতেন, এবং তাদের তাহনিক করাতেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমামা বিনতে যায়নাবকে বহন করে সালাত আদায় করতেন, সিজদায় যাওয়ার সময় নামিয়ে রাখতেন, আবার যখন দাঁড়াতেন উঠিয়ে নিতেন।

এ দয়াময় অনুগ্রহশীল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমার রবের অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

একচল্লিশতম আসর: রহমতের নবী (৪)

সেবক ও কৃতদাসদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া

ইসলাম পূর্ব যুগে চাকর, কৃতদাসদের কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না, যখন আল্লাহ ইসলাম দিয়ে পৃথিবীকে মর্যাদাবান করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল অধিকার বঞ্চিতদের থেকে দূর করে দিলেন সকল প্রকার অত্যাচার-অবিচার আর প্রতিষ্ঠা করলেন তাদের অধিকার। যারা তাদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করত, ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করত কিংবা তিরস্কার-ভৎসনা করত তিনি তাদেরকে কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়ে সতর্ক করেছেন।

মারূর বিন সুয়াইদ বলেনঃ আমি আবু যর রা. কে দেখলাম, তিনি যে পোশাক পরিধান করতেন, তাঁর চাকরকে ঠিক ঐ মানের পোশাকই পরিধান করতে দিতেন, তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বললেন: রাসূলের যুগে তিনি একজন লোককে গালি দিয়েছিলেন- তাকে তার মায়ের নামে

তিরস্কার করেছিলেন- লোকটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নালিশ করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

إِنَّكَ امرؤٌ فيك جاهلية

তুমি এমন লোক যার মাঝে জাহিলিয়াত বিরাজিত। তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ তোমাদের চাকর-বাকর, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, সুতরাং যার অধীনে তার ভাই থাকবে, তার উচিত সে যা খাবে তাকেও তা খাওয়াবে, সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান করাবে, তাদের কষ্ট হয় এমন বোঝা তাদের চাপিয়ে দিবে না, আর যদি দাও তবে তাদের সহায়তা করবে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ: লক্ষ্য করে দেখুন, কিভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন চাকরকে ভাইয়ের মর্যাদার আসন দান করলেন। যাতে প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে একথা স্থিরভাবে প্রথিত হয়ে যায়, সে যদি তার চাকর, কর্মচারী অথবা কৃতদাস শ্রেণির লোকদের উপর অত্যাচার করে, তাহলে যেন নিজ ভাইয়ের সাথেই এ আচরণ করল। অতঃপর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাদের প্রতি অনুগ্রহ-দয়া, সম্মান প্রদর্শন, খাবার প্রদান ও পরিধেয় দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়ার জন্যে বিশেষভাবে আদেশ প্রদান করলেন। বললেন: সে নিজে যা খাবে তাকেও তাই খেতে দেবে। নিজে যা পরিধান করবে তাকেও তাই পরতে দেবে। আর তাই আবু যর রা. নিজে যা পরিধান করতেন খাদেমকেও তা-ই পরতে দিতেন। অনুরূপ সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দিতেও নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা পরোক্ষ ভাবে আদেশ করছে যে তাদের থেকে কাজ নেয়ার ক্ষেত্রে সহজ করতে হবে এবং বিশ্রামের জন্যে যথেষ্ট সময় দিতে হবে।

আবু মাসউদ আনসারী রা. বলেনঃ আমি আমার এক গৃহভৃত্যকে চাবুক দিয়ে প্রহার করছিলাম, হঠাৎ আমার পিছন থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, اعلَم أبا مسعود। জেনে রাখ! হে আবু মাসউদ। রাগে আমি আওয়াজ বুঝতে পারছিলাম না। যখন তিনি আমার নিকটে আসলেন, তাকিয়ে দেখি, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলছেন: জেনে রাখ! আবু মাসউদ। তিনি বলেন, অত:পর আমি হাত থেকে চাবুক ফেলে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন: জেনে রাখ! হে আবু মাসউদ! তুমি এ গোলামের উপর যতটুকু ক্ষমতাবান, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমার উপর এর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। আমি বললাম: আজকের পর থেকে আমি আর কখনো কোন গোলামকে প্রহার করব না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি বললাম: আল্লাহর রাসূল সে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি তুমি তা না করতে, অবশ্যই তোমাকে (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করতো।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন: যে স্বীয় গোলামকে চপেটাঘাত করবে, তার প্রতিকার হল সে তাকে আযাদ করে দেবে।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই- ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি দুর্বলদের রক্ষা করেছেন, কৃতদাসদের মুক্ত করেছেন, চাকর-বাকরদের সাথে সুবিচার করেছেন, ভগ্ন হৃদয়দের মাঝে থেকে তাদের দুঃখ-কষ্ট খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং তা লাঘব করার জন্যে আজীবন জিহাদ করেছেন। এবং প্রশান্ত করেছেন তাদের হৃদয় মন।

মুআবিয়া বিন সুয়াইদ বিন মুকরিন বলেন: আমাদের একজন কৃতদাসকে আমি চপেটাঘাত করেছিলাম, তারপর তাকে ও আমাকে আমার পিতা ডেকে বললেন: এর থেকে তুমি কেসাস

(প্রতিশোধ) গ্রহণ কর। আমরা মুকরিন গোত্রের লোকেরা রাসূলের যুগে মাত্র সাতজন ছিলাম, আর আমাদের খাদেম ছিল মাত্র একজন। আমাদের এক লোক তাকে চপেটাঘাত করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাকে তোমরা মুক্ত করে দাও।
সবাই বলল: আমাদের তো অন্য কোন খাদেম নেই। তখন তাকে বলল: তুমি তাদের খেদমত কর, তাদের প্রয়োজনমুক্ত হওয়া পর্যন্ত। যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে তখন তাদের উচিত তাকে মুক্ত করে দেয়া।
এ হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর চাকর-বাকর এবং কৃতদাসদের সাথে এই ছিল তাঁর অবস্থান। যারা মানব স্বাধীনতার দাবি করছে এবং এ ব্যাপারে খুব সোচ্চার প্রমাণ করার চেষ্টা করছে প্রতিনিয়ত: রাসূলুল্লাহর এই অবস্থানের তুলনায় তারা কোথায়?
খাদেমদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজের আচরণের বাস্তব নমুনার প্রতি লক্ষ্য করুন।
আনাস বিন মালেক রা. বলেন: আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি, আল্লাহর শপথ করে বলছি: তিনি আমার কোন কাজে কখনো উফ্‌ফ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি। এবং আমি কোন কাজ করার পর, বলেননি কেন করেছ? আর না করলে বলেননি- কেন করোনি?
অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি আমাকে কখনো কোন দোষারোপ করেননি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খাদেমকে জিজ্ঞেস করতেন: তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?
আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: মদীনার কোন বাঁদি যদি রাসূলুল্লাহ স. এর হাত ধরত তাহলে তিনি স্বীয় হাত বাঁদির হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতেন না যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজনে মদীনার যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত।

বেয়াল্লিশতম আসর: রাসূলুল্লাহর দানশীলতা

বদান্যতা, মহানুভবতা, দানশীলতা ও উদারতার ক্ষেত্রে কেউই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমকক্ষ হতে পারেনি এবং পারবেও না।
দানশীলতার সব কয়টি স্তরই তিনি অতিক্রম করেছেন। সর্বোচ্চ স্তর হলো : আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবন উৎসর্গ করা। কবির ভাষায় :-

يجود بالنفس إن ضن البخيل بها   والجود بالنفس أقصى غاية الجود

তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করছেন, যদিও কৃপণ ব্যক্তি নিজের জীবন দান করতে চায় না, আর জীবন উৎসর্গ করাই হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের বদান্যতা।
শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ করার সময় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের খুব কাছাকাছি তিনিই অবস্থান করতেন। বীর বিক্রম যোদ্ধারাই কেবল তার সাথে অবস্থান করতে পারত।
তিনি সর্বদা ইল্‌ম দানে নিরত থাকতেন। আল্লাহ তাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সার্বক্ষণিক সাহাবাগণকে তা শিক্ষা দিতেন। তাদেরকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। শিক্ষা দানের ব্যাপারে তাদের সাথে নম্রতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন, সব সময় বলতেন :

إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً. رواه مسلم

আল্লাহ আমাকে কঠোর ও রূঢ় বানিয়ে প্রেরণ করেন নি, বরং একজন সহজকারী শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন।
তিনি আরো বলেন :

إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم. رواه أحمد

আমি তোমাদের জন্যে পিতৃসমতুল্য, তোমাদের আমি শিক্ষা দান করি।
প্রশ্নকারী কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাড়িয়ে বলতেন। আর এটি ইলম শিক্ষাদানের ব্যাপারে উদারতার পরিচয় বহন করে। তাকে কেউ সমুদ্রের পানির পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে তিনি বললেন:

هو الطهور ماؤه والحل ميتته، رواه أحمد

সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল।
মুসলমানদের কল্যাণ এবং তাদের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে তাঁর সময় ও আরাম-আয়েশ কুরবানী করার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি এ ক্ষেত্রেও সকল মানুষের মধ্যে এগিয়ে আছেন। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তই এর প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট :
মদীনার কোন একজন কৃতদাসী তার হাত ধরে স্বীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহানুভবতার উত্তম দৃষ্টান্ত, তিনি বলেন :

ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال : لا. متفق عليه

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনও না বলতেন না।
আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইসলামের বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে দিতেন। এক ব্যক্তি তার নিকট আসল, তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে থাকা সবগুলো ছাগল দিয়ে দিলেন। সে লোক আপন সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল : হে আমার জাতি, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, কেননা মুহাম্মদ এমনভাবে দান করেন, মনে হয় তিনি কোন দরিদ্রতার ভয় করেন না।
আনাস রা. বলেন : কোন ব্যক্তি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে সকালে মুসলমান হলে, বিকাল হওয়ার পূর্বে ইসলাম তার নিকট দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হয়ে যেত।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধের পর সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে তিন শত উট দিয়েছিলেন। অতঃপর সে বলল : আল্লাহর কসম, আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দিয়েছেন। তিনি আমার কাছে সর্বাধিক অপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, অত:পর ক্রমান্বয়ে দান করতে করতে সকল মানুষ অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়ে গিয়েছেন।
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। আর এ দানশীলতা রমজানে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেত।
কারণ, রমজান মাসে জিবরাইল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাকে কুরআনের প্রশিক্ষণ দিতেন। আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন প্রবল বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথি-সঙ্গীরা হুনাইনের যুদ্ধ হতে ফেরার পথে কতক বেদুইন লোক তার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে চাইতে লাগল। তাদের চাপাচাপিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামুরা বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। ইতিমধ্যে গাছে তার চাদর আঁটকে পড়লে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গীদের বললেন তোমরা আমার চাদর ফিরিয়ে নিয়ে আস। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যদি আমার কাছে এ বাগানে অবস্থিত গাছের সমপরিমাণও চতুষ্পদ জন্তু থাকতো তাহলে আমি সবই তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। তারপরও তোমরা আমাকে কৃপণ হিসেবে দেখতে পেতে না এবং মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ হিসেবেও না।

দানশীলতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিরাচরিত আদর্শ, এমনকি তিনি নবী হওয়ার পূর্বেও দানশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

যেমন, হেরা গুহায় ফেরেশতা জিবরাইল ওহী নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর তিনি কাঁপতে কাঁপতে যখন খাদিজা রা. এর নিকট ফিরে আসলেন। তখন তাকে তিনি এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কখনও নয়, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, দুস্থ-অসহায় মানুষের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের সহযোগিতা করেন এবং বিপদাপদে লোকদের আপনি সহযোগিতা করেন।

এবং আনাস রা. বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামী কালের জন্য কোন কিছু জমা করে রাখতেন না।

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, কিছু সংখ্যক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী দান করলেন, তারা আবারও প্রার্থনা করলে তিনি আবারও দিলেন, এরপর তারা আবারও প্রার্থনা করে, তিনি আবারো তাদের দান করেন। এভাবে যখন দান করতে করতে সব শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট কিছু আসলে এমন হয় না যে আমি তোমাদের না দিয়ে জমা করে রাখি। আর যে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেন। আর যে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের তাওফীক দেন। কোন ব্যক্তি সবর অপেক্ষা উত্তম ও বৃহত্তর আর কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হয়নি।

সমাপ্ত